…সাত্যকির ভাষাহীন মুখ যেন কাগজের মতো সাদা !

নীল আলো

টেলিফোনে-পাওয়া

মেয়ে

শ্রীমতী মালতী বটব্যালকে

১১এ চৌরঙ্গী টেরাস্‌, কলিকাতা
আষাঢ়, ১৩৪৯

সৌরীন্দ্র

নীল আলো

প্রথম পরিচ্ছেদ

টেলিগ্রাম

হাওড়া ষ্টেশন। ষ্টেশনের ওয়েটিং-হল। নাগপুর-প্যাশেঞ্জার আসিয়া পৌঁছিবার কথা সন্ধ্যা সাড়ে-ছ'টায়। ষ্টেশনের প্রশস্ত ওয়েটিং-হল লোকে লোকারণ্য। যারা বি-এন লাইনে বা ই-আই লাইনে বাহিরে যাইবে, এমন প্রায় পাঁচশো যাত্রী মাল-পত্র লইয়া যেন সে-হল কামড়াইয়া পড়িয়া আছে! তাদের হুঁশিয়ারীর অন্ত নাই! পাছে ট্রেণ ফেল হয়, এই ভয়ে নিজেদের নির্দ্দিস্ট ট্রেণ ছাড়িবার পাঁচ-সাত ঘণ্টা আগে হইতে সব ষ্টেশনে আসিয়া জমিয়াছে।

ছ'টা বাজিয়া পনেরো-মিনিট। এই লোকারণ্যের ফাঁকে-ফাঁকে পা ফেলিয়া দেখিয়া-শুনিয়া ডিটেক্‌টিভ হিমাংশুবাবু-আসিয়া প্ল্যাটফর্ম্ম এবং ওয়েটিং-হলের মাঝখানে যে লোহার বেড়া,—সেই বেড়ার পূব-দিকে চুপ করিয়া দাঁড়াইলেন। সতর্ক হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁকে যারা জানে, তারা তাঁর দাঁড়াইবার ভঙ্গী দেখিলে ঠিক বুঝিবে, ট্রেণে বোধ হয় কোনো ইপ্সিত-

আসামীর আসিবার সম্ভাবনা আছে, তার জন্যই হিমাংশুবাবু এমন সতর্ক-ভঙ্গীতে আসিয়া এখানে দাঁড়াইয়াছেন !

নাগপুর প্যাশেঞ্জার যথাসময়ে আসিয়া প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইল। গাড়ীর কামরা হইতে অসংখ্য যাত্রী প্ল্যাটফর্ম্মে নামিল— সকল-জাতের যাত্রী ! নামিয়া কে আগে বাহির হইবে, সেজন্য যেন বাজি রাখিয়া পাল্লা দিয়া যাত্রীদের দ্রুত-পায়ে চলার কশরতির সীমা নাই !

বেড়ায় একটুখানি ফাঁক। সেই ফাঁকের মধ্য দিয়া যাত্রীরা বাহিরে আসিতেছে। দু'চোখে একাগ্র-উন্মুখ দৃষ্টি লইয়া হিমাংশু প্রত্যেকটি যাত্রীর মুখের পানে চাহিয়া দেখিতেছেন !

কোনো আসামীর জন্য তিনি আজ স্টেশনে আসেন নাই। তিনি আসিয়াছেন বহুদিনকার বন্ধু সাত্যকি মিত্রের প্রত্যাশায়। সাত্যকি মিত্র ধনী লোক—জমিদার। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বৎসর। আজ প্রায় দু' তিন বৎসর সাত্যকি মিত্রের সঙ্গে হিমাংশুর দেখা-সাক্ষাৎ নাই ! শুনিয়াছিলেন, সাত্যকি বাহিরে কোথায় বেড়াইতে গিয়াছে—সি-পি অর্থাৎ সেণ্ট্রাল-প্রভিনসেশের দিকে। কোথায়, তা জানিতেন না। হঠাৎ কেন যে তিনি সেখানে গেলেন, সে সংবাদ হিমাংশু যেমন জানেন না, তেমনি সাত্যকি মিত্রের বন্ধু-মহলেও এ-যাওয়ার কারণ সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত।

আজ প্রায় তিন বছর পরে হিমাংশু তার টেলিগ্রাম পাইয়াছেন। টেলিগ্রামে লেখা—

নাগপুর প্যাশেঞ্জারে আজ হাওড়া পৌঁছিব।
ষ্টেশনে নিশ্চয় আসিবে। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়।

তলায় নাম লেখা—

SATKI

নীল আলো

টেলিগ্রাম পাইয়া হিমাংশু তাহা উপেক্ষা করিলেন না' জরুরি দু'চারিটা হাতের কাজ সারিয়া বাঙালী ভদ্রলোকের বেশ ত্যাগ করিয়া সাদা শর্ট এবং টুইলের সার্টে অঙ্গ-ভূষণ সম্পাদন করিয়া ষ্টেশনে আসিয়া উদয় হইয়াছেন।

সাত্যকির টেলিগ্রামের কথা লইয়া মনে মনে অনেকখানি নাড়াচাড়া করিয়াছেন। সাত্যকি দু'তিন বৎসর বাড়ী-ছাড়া,—দেশ-ছাড়া। এ দু'তিন বৎসরে একখানা চিঠি লিখিয়া সাত্যকি না দিয়াছে নিজের খপর, না লইয়াছে হিমাংশুর কোনো খপর' তারপর হাওড়া ষ্টেশনে হাজির থাকিবার জন্য অকস্মাৎ টেলিগ্রাম পাঠাইয়া এ-জরুরি আহ্বান···কেন? কেন?···

সাত্যকির বন্ধু-বান্ধবের অভাব নাই' ধনী বন্ধু আছে, যাদের কাজ নাই, কর্ম্ম নাই—দুপুরবেলায় বাড়ীতে বসিয়া ব্রিজ খেলিয়া সময় কাটায়; বৈকালে মোটরে চড়িয়া মাঠে-বাটে হাওয়া খাইয়া বেড়ায়; রাত্রে সিনেমায় যায়; নাহয় বাড়ীতে বসিয়া তাস খেলে, লুডো খেলে··সাত্যকি তাদের কাহাকেও ডাকে নাই' গৃহস্থ বন্ধু আছে, উকিল বন্ধু আছে, ডাক্তার বন্ধু আছে—তাদেরো কাহাকেও ডাকে নাই—ডাকিয়াছে তাকে' তিনি পুলিশ-অফিসার' নানা কাজে হিমাংশুকে ব্যস্ত থাকিতে হয়। হিমাংশু কবে কখন কোথায় থাকিবেন, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নাই—সাত্যকি জানে। জানিয়াও সকলকে ত্যাগ করিয়া হিমাংশুকে টেলিগ্রাম! তার মানে, নিশ্চয় কোনো বিপত্তি আশঙ্কা করিয়া সাত্যকি চায় হিমাংশুর সাহায্য! এবং সে-সাহায্য কলিকাতায় নামিবার সঙ্গে সঙ্গে···

এমন যদি বিপদের ভয়, তাহা হইলে ট্রেণে চড়িয়া টেলিগ্রাম না করিয়া দুদিন আগে একখানা চিঠি লিখিয়া সব কথা

নীল আলো

হিমাংশুকে খুলিয়া লেখা উচিত ছিল। চিঠি না লিখিয়া এত সংক্ষেপে টেলিগ্রামে শুধু ষ্টেশনে আসিবার অনুরোধ…

হিমাংশুর মনে সংশয়ের যে খণ্ড মেঘ জমিতেছিল, সে মেঘের প্রসার ভেদ করিয়া ইঙ্গিতে এমন-একটু আলোর রশ্মি দেখা যায় না, যে-আলোয় ভিতরকার রহস্য সম্বন্ধে কোনো [illegible]…

হঠাৎ ভিড়ের মধ্য হইতে সাহেবী পোষাক-পরা একজন যাত্রী তাঁর গায়ে কনুইয়ে একটা [illegible] ধাক্কা দিয়া জনতার মধ্যে মিশিয়া গেল। সে ধাক্কায় হিমাংশু সে-যাত্রীর পানে চাহিয়া দেখিলেন।

ও-যাত্রী? না, অপরিচিত। ও তো সাত্যকি নয়। তবে যাত্রীর সঙ্গে একটা কুলি…কুলির মাথায় হোল্ড-অল এবং একটা সুটকেশ। সুটকেশের গায়ে কাগজের লেবেল আঁটা। লেবেলে নাম লেখা রহিয়াছে—SATKI।

হিমাংশু তখনি সেই যাত্রীর উপর নজর রাখিয়া তার অনুগমন করিলেন। কুলি সমেত যাত্রী প্ল্যাটফর্মের বাহিরে গেল না। ওদিকে দোতলায় ফার্স্ট ও সেকেণ্ড ক্লাশ যাত্রীদের জন্য যে ওয়েটিং-হল আছে, সিঁড়ি দিয়া যাত্রী উঠিল দোতলায় সেই ওয়েটিং-হলে। হিমাংশু তার পিছনে চলিলেন এবং সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিলেন। তিনি যেন যাত্রীর অনুসরণ করেন নাই—স্বতন্ত্র ভাবে চলিয়াছেন,—এ [illegible] রক্ষা করিয়া দোতলায় উঠিলেন।

দোতলায় খোলা বারান্দা। এখানে বিক্ষিপ্ত কখানা বেতের চেয়ার। বারান্দায় আসিয়া হিমাংশু দেখিলেন, কুলি মাল-পত্র নামাইয়াছে এবং যাত্রী তাকে বলিতেছে,—বয়কে গিয়ে বলো একপেয়ালা চা আর টোস্ট-রুটি দিয়ে যাবে…

নীল আলো

কুলি চলিয়া গেলে যাত্রী চেয়ারে বসিল। বসিয়া মাথার পাগড়ী খুলিয়া সে-পাগড়ী রাখিল পায়ের কাছে; রাখিয়া রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিল!

সামনে দিয়া পায়চারি করিয়া হিমাংশু দু'বার তার পানে চাহিলেন। তার পরের বার পদচারণা-কালে যাত্রী যাচিয়া কথা কহিল। বলিল—শুনছেন···ও মশায়?

এ-কণ্ঠস্বর হিমাংশু চিনিলেন। বলিলেন—আমায় বলচেন?

—হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করছি, আপনাদের হাওড়ায় ভদ্র-রকম হোটেল পাবো? দু'এক মাস থাকা যায়, এমন হোটেল?

হিমাংশু কাছে আসিলেন। বলিলেন—হোটেল! বলিয়া চেয়ার টানিয়া যাত্রীর সামনে বসিলেন।

স্বর মৃদু করিয়া যাত্রী বলিল—আমাকে চিনতে পেরেছো?

চারিদিকে চাহিয়া হিমাংশু বলিলেন—সাত্যকি!

—হ্যাঁ। কিন্তু বেশভূষায় আর সাত্যকি নই···নাম নিয়েছি সাট্‌কি তারপুরওয়ালা!

হিমাংশু মৃদু হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন—ছেলেবেলার সেই ছড়া মনে পড়ছে, বন থেকে বেরুলো টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে! ব্যাপার তাহলে বেশ রোমাঞ্চকর বলো?

সাত্যকি বলিল—নিশ্চয়! বলবো। কিন্তু কখন আর কোথায় বলবো, ঠিক করতে পারছি না।···যে করে আমার দিন কাটছে···দেখবে?

বলিয়া কোটের হাতা গুটাইয়া ডান হাত প্রসারিত করিয়া যাত্রী দেখাইল। বলিল—আমার হাতে হাত দিয়ে ছাখো।

সাত্যকির কর স্পর্শ করিয়া হিমাংশু দেখেন,—টিনের পাত্‌লা-পাতে হাত আগাগোড়া মোড়া।

সাত্যকি বলিল—জামা আর পেণ্টুলেনের নীচে সর্ব্বাঙ্গে এমনি লোহার পাত্‌লা-চাদরের তৈরী 'আর্মার' আঁটা। গুপ্ত-ঘাতকের ছুরি-ছোরা বা বিষ-মাখা তীর কখন্ এসে গায়ে পড়বে···সর্ব্বক্ষণ হুঁশিয়ার আছি! মুখের উপর কালো রবারের মুখোশ এঁটেছি। নিজের মূর্ত্তি বদলে স্রেফ অন্য লোক সেজেছি।

কথা শুনিয়া হিমাংশুর সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চরেখা! হিমাংশু বলিলেন—দু'তিন বছরে কি এমন কাণ্ড করেছো সাত্যকি?

সাত্যকি বলিল—রামটেক্ জানো? নাগপুর থেকে ছাব্বিশ মাইল দূরে। রামটেকে মস্ত মন্দির আছে। কিন্তু সে-মন্দিরের কথা বলছি না। রামটেকের কথাও বলছি না। এই রামটেক থেকে পূবদিকে প্রায় দশ মাইল দূরে ভীষণ জঙ্গল। সেই জঙ্গলে পাহাড়ের মাথায় ভাঙ্গা একখানা বাড়ী। বাড়ী এখন নেই, কতকগুলো পাথর মাত্র···বাড়ীর চিহ্ন। সেখানে ডাকাতের আস্তানা ছিল। আমি সেই আস্তানায় গিয়েছিলুম। গিয়ে সেখানে দেখেছি হীরা, চুণী, পান্নার স্তূপ! কোথা থেকে এলো, সে-সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের দল সন্ধান করুন···আমার তাতে লোভ নেই। কিন্তু সেই সব মণি-রত্ন এখন এক-রকম বেওয়ারিশ ভাবে পড়ে আছে। তার আট-দশখানি বহু কষ্টে সংগ্রহ করেছি। করে বাকীগুলির লোভে আবার ছুটেছিলুম! এমন সময় পিছনে লাগলো ফেউ···অর্থাৎ নানা রকম মূর্ত্তি··· নানা রকম বিভীষিকা! ভৌতিক নয়! প্রত্যক্ষ নর-শরীরধারী বিভীষিকা! প্রাণ নিয়ে কোনোমতে চলে এসেছি। তারা কিন্তু সঙ্গ ছাড়েনি। কত জায়গায় গিয়েছি, তাদের চোখে ধূলো দেবার জন্য কত কশরৎ করেছি, সে-সব কথা শুনলে মনে হবে যেন থ্রিলার-উপন্যাস! সে-সব কথা বলবার যদি সময়

কখনো পাই, বলবো। কিন্তু এখন আমায় কোনো রকমে নিরাপদ করতে হবে, ভাই। তারপর…ওঃ…সে-যা ব্যাপার …মনে করতেই গায়ে কি-রকম কাঁটা দিচ্ছে, ছাখো!

হোটেলের বয় আসিল। তার হাতে চা, টোস্ট-রুটি।

সাত্যকি চাহিল হিমাংশুর পানে, বলিল—কিছু খাবে?

হিমাংশু বলিলেন—না।

বয় চলিয়া গেল। চা পান করিয়া সাত্যকি কণ্ঠতালু আর্দ্র করিয়া লইল। তারপর পেয়ালা নামাইয়া টোস্ট মুখে দিল। সাত্যকির দৃষ্টি সামনে ঐ গঙ্গা-বক্ষে। গঙ্গার বুকে ছোট বড় বহু ষ্টীমার…নৌকা…পুলের উপরে গাড়ীর ভিড়, লোকের ভিড়। ওপারে ওদিকে ঐ হাইকোর্টের চূড়া। এদিকে সার-সার বড় বড় বাড়ী……সৌধ-কিরীটিনী নগরীর বিরাট মহিমা!…

হঠাৎ ভীত আর্ত্ত-কণ্ঠে সাত্যকি চীৎকার করিয়া উঠিল,—এখানেও এসেছে! ঐ…ঐ…ঐ ছাখো হিমাংশু!

সাত্যকির নির্দ্দেশ-মতে ওপারে কলিকাতার দিকে চাহিয়া হিমাংশু দেখিলেন, আকাশে নীল আলোর ছটা! হ্যারিসন রোডের মোড়ে পাঁচ-সাত-তলা বাড়ী…সব-সামনেকার উঁচু বাড়ীর ছাদে কে দীপক জ্বালিয়াছে…জোরালো দীপক…নীল আলোর দীপক! সে নীল আলোয় সারা আকাশ নীল হইয়া গিয়াছে!

—এ আলোর মানে? হিমাংশু প্রশ্ন করিলেন।

প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চাহিলেন সাত্যকির পানে। দেখিলেন, সাত্যকি নির্ব্বাক! তার সেই ভাষাহীন মুখ যেন কাগজের মতো সাদা! হিমাংশু ডাকিলেন—সাত্যকি…

সাত্যকি চাহিল হিমাংশুর পানে। বলিল—ঐ···ওদের সঙ্কেত!

—কিসের সঙ্কেত? কাদের সঙ্কেত, সাত্যকি?

সাত্যকি আর-একবার চারিদিকে চাহিল, তারপর কণ্ঠ মৃদু করিয়া বলিল—আমি মণি-রত্নের সন্ধান পেয়েছি, এ-খপর জানার পর থেকে ওরা আমার পাছু নেছে। ঐ অলোর ইঙ্গিত! রামটেক থেকে ছাব্বিশ মাইল দূরে যে পাহাড় আর জঙ্গলের কথা বলেছি, সেই পাহাড় আর জঙ্গলের নাম বন-কাঠি। এ আলো প্রথম দেখেছি সেই বন-কাঠিতে। তারপর ট্রেণে আসতে আসতে এ আলো দেখেছি···বনের মধ্যে মাঝে-মাঝে নীল আলো জ্বলে উঠেছে! রাত্রে ট্রেণ চলেছে···দুধারে বন আর জঙ্গল, সেই জঙ্গলে এমনি নীল আলো! ওরা আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে কলকাতাতে···নিশ্চয়! নাহলে কলকাতার আকাশে ও-আলো দেখতুম না!···ট্রেণ থেকে নেমে আমি এখানে এসেছি, হয়তো আমার হদিশ পায়নি। যে বা যারা আমার সঙ্গ নেছে, তারা উঠেছে গিয়ে ওপারে কলকাতায়।··· কিন্তু এখানে বসে এ-কথা আর নয়, হিমাংশু···রাত্রেও নয়। এখন আমরা কোনোমতে সরে পড়ি, এসো। তোমায় দেখে চিনতে পারবে। তোমার সঙ্গে আমি যাবো না। তবে দূরে নয়, এমন কাছাকাছি ভাবে আমরা যাবো, দু'জনে যেন দু'জনের চোখে-চোখে থাকি···অথচ অপরে না বুঝতে পারে! আমার মুখে রবারের মুখোশ আছে···যে করে এ মুখোশ সংগ্রহ করেছি, ওঃ! মুখোশের জন্য আমায় ঠিক চিনতে পারেনি, এইটুকুই আমার ভরসা!

হিমাংশু বলিলেন—তাহলে দু'খানা ট্যাক্সি ডাকা যাক।

একটায় থাকবে তুমি, আর-একটায় আমি। তোমার ট্যাক্সি থাকবে আগে-আগে, আমার ট্যাক্সি থাকবে পিছনে…এমনি করে দুজনে গিয়ে উঠবো তোমার বাড়ীতে। কেমন?

সাত্যকি বলিল—না, না, তোমার বাড়ীতে উঠবো।

—বেশ। তাহলে কুলির মাথায় তোমার লগেজ তুলিয়ে নীচে চলো। আমি গিয়ে দু'খানা ট্যাক্সি ঠিক করি।

দুজনে নামিয়া আসিবেন, সিঁড়ির মুখে আসিবামাত্র দেখেন, পাগড়ী-মাথায় মাহাটী-চেহারার দুজন লোক…

তারা থমকিয়া দাঁড়াইল। চকিতের জন্য! তারপর নিঃশব্দে দোতলার বারান্দায় গিয়া উঠিল।

সিঁড়ির নীচে আসিয়া সাত্যকি দাঁড়াইল হিমাংশুর গা ঘেঁষিয়া, বলিল—দুটি অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখলে তো…উপরে গেল।

হিমাংশু বলিলেন,—দেখেছি।

—নিশ্চয় ওদের চর। এমনি মূর্ত্তিই আমার পিছনে ঘুরছে ছায়ার মতো।

—এরাই?

—ঠিক এরা না হতে পারে, তবে বেশভূষা হচ্ছে এই… মাথায় সাদা পাগড়ী,আর মুখে ওমনি কালো রঙের কালো গোঁফ।

হিমাংশু বলিলেন—তুমি দাঁড়াও…আমি একবার ওপরে গিয়ে মূর্ত্তি দুটিকে দেখে আসি।

সাত্যকি বলিল—যাবে?

হিমাংশু বলিলেন—ভয় নেই। আমার আর্দালী আছে সঙ্গে। ঐ…ওকে বলে যাচ্ছি, ও তোমার পাহারাদারী করবে।

বলিয়া হিমাংশু ডাকিলেন আর্দালীকে। ডাকিয়া তাহাকে পাহারা দিবার কথা বলিয়া হিমাংশু দোতলার বারান্দায় উঠিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মানুষ চুরি

দোতলায় উঠিয়া হিমাংশু দেখেন, সে দুটি লোক বারান্দার রেলিঙের ধারে দাঁড়াইয়া ওপারে কলিকাতার দিকে চাহিয়া আছে···একজনের হাতে একটা টর্চ্চ।

হিমাংশু তাদের সামনে আসিয়া বলিলেন—এখানে কি করিতেছ?

ইংরেজীতে প্রশ্ন করিলেন।

বিস্মিত দৃষ্টিতে তারা হিমাংশুর পানে চাহিল! হিমাংশু বলিলেন—জবাব দাও।

এক-নম্বর বলিল—জবাব যদি না দি?

এক-নম্বর জবাব দিল ইংরেজীতে।

হিমাংশু বলিলেন—উপরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের স্থান। এটা হাওয়া খাইবার ময়দান নয় যে যে-সে লোক এখানে আসিবে!

দু'নম্বর বলিল—আপনার ইম্‌পার্টিনেন্স (স্পর্দ্ধা) দেখিতেছি সীমাহীন!

হিমাংশু বলিলেন—ইম্‌পার্টিনেন্স!···হুঁ···আচ্ছা, দেখি আপনাদের টিকিট।

এক-নম্বর বলিল—ইম্‌পার্টিনেন্স সীমাহীন, সত্য! আপনাকে দেখিয়া মনে হইতেছে, আপনি রেলোয়ে-এম্প্লয়ী নন।

আমাদের কাছ হইতে টিকিট চাহিয়া দেখিবার আপনার কি অধিকার আছে, আগে সে প্রশ্নের উত্তর দিন।

হিমাংশু বলিলেন—সে উত্তর ট্রেশপাসারকে দিতে আমি বাধ্য নই।

দু'নম্বর বলিল—ট্রেশপাসারকে টিকিট-সম্বন্ধে কোনো কথা বলিতে আমরাও বাধ্য নই।

এ প্রগল্‌ভতায় হিমাংশুর রাগ হইল। কিন্তু সে-রাগ মনে চাপিয়া তিনি বলিলেন—আপনারা সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ না দিতে পারিলে আপনাদের আমি গ্রেফ্‌তার করিব। গ্রেফ্‌তার করিবার অধিকার আমার আছে।

হাসিয়া এক-নম্বর বলিল—সে কষ্ট আপনাকে স্বীকার করিতে হইবে না। টিকিট না দেখাইতে পারিতাম। তবু বেশ, এই দেখুন টিকিট।

এ-কথা বলিয়া এক-নম্বর পাগড়ীওয়ালা পকেট হইতে দুখানা টিকিট বাহির করিল, বলিল,—টর্চ আছে আমাদের কাছে… তার আলোয় দেখুন ··ফার্স্ট ক্লাশের টিকিট···থার্ড ক্লাশ নয়। এই দেখুন দুখানা রিটার্ণ-হাফ্—হাওড়া হইতে রামটেক।

রামটেক! হিমাংশুর মাথার মধ্যে রক্ত চন্‌চন্ করিয়া উঠিল। চকিতের দ্বিধা···কিন্তু তখনি তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন; বলিলেন—রামটেকের জন্যই আমি প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। ওপারে ঐ নীল আলো ··ও আলোও রামটেকের! আপনারাও সেই রামটেকের! বাঃ! আমি সন্ধানে জানিয়াছি, রামটেক হইতে শয়তানীর জন্য কলিকাতায় লোক আসিয়াছে এবং তাহাদের গ্রেফ্‌তার করিবার ভার আমার উপর। তোমাদের আমি গ্রেফ্‌তার করিলাম।

হিমাংশু বলিলেন—যারা ছুটছিল, তাদের মাথায় পাগড়ী ছিল ?

—ছিল। সাদা পাগড়ী।

—ক'জন লোক ছুটছিল ?

—তা প্রায় সাত-আটজন।

সাত-আটজন! হিমাংশুর বিস্ময়ের সীমা নাই! কিন্তু বিস্ময়ে অভিভূত হইবার সময় এখন নয়।

তিনি বলিলেন—খোঁজো সে-ভদ্রলোককে। চোখের সামনে থেকে লগেজ চুরি যায়, জানি। তা ব'লে জ্যান্ত-মানুষ চুরি! এ-কথা কেউ বিশ্বাস করবে না! এসো।

দু'জনে বাহিরে আসিলেন। বাহিরে ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডা। সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—পাগড়ীওলা সাত-আটজন লোক, তাদের সঙ্গে বিলাতী-পোষাক-পরা ভদ্রলোক, সঙ্গে কুলি, কুলির মাথায় সুটকেশ···কেহ দেখিয়াছে কি না ?

তারা বলিল, দেখে নাই।

হিমাংশু বলিলেন—অন্য মোটর-টোটর এ-পথ দিয়ে গেছে ?

তারা বলিল—গাড়ী তো হামেশা যাচ্ছে-আসছে বাবু!

ঠিক কথা! হাওড়া স্টেশন···স্টেশনের সামনে গাড়ী চলিতেছে সারাক্ষণ।

হিমাংশু একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। সাত্যকিকে গাপ্ করিয়া লইয়া গেল, ইহাও সম্ভব ? এ কি বিশ্বাস করিবার কথা!

তিনি রেলোয়ে-পুলিশের অফিসে গেলেন! একটু দক্ষিণে পুলিশ-অফিস। সেখানে সব কথা বলিয়া খাতায় একটা নালিশ লিখাইয়া দিলেন।

নীল আলো

পুলিশের ইন্‌সপেক্টর তাঁর কথা শুনিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। ছোট ছেলেমেয়ে নয়! ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর বয়সের সুস্থ জোয়ান পুরুষ-মানুষ…চোরে তাকে চুরি করিয়া লইয়া গেছে?

হিমাংশু বলিলেন—আপনি সন্ধান নিন। আমি এখন এক মিনিট দাঁড়াতে পারবো না। এখনি ওপারে যেতে হবে।

তিনি চাহিলেন ওপারের আলোর দিকে…সেই নীল আলো।

দেখেন, নাই। নীল আলো নিবিয়া গিয়াছে।

হিমাংশুর মাথার মধ্যে আবার রক্ত ছলাৎ করিয়া উঠিল।

হিমাংশু আর এক-নিমেষ দাঁড়াইলেন না। দেখিয়া-শুনিয়া একখানা টুরার-ট্যাক্সি ডাকিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিলেন। আর্দালী রামাবতার উঠিল সামনে ড্রাইভারের পাশে। হিমাংশু বলিলেন—চলো কলকাতা…

ট্যাক্সি চলিল। পুলের উপরে ভীষণ ভিড়। পুলের দুদিককার ফুটপাথে লোকের পর লোক। পুলের বুকে ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ী, লরি, মোষের গাড়ী। গাড়ীতে বসিয়া হিমাংশু চাহিলেন পুলের ওপারে হ্যারিসন রোডের মোড়ে সেই উঁচু বাড়ীর দিকে। যে-বাড়ীর ছাদ হইতে নীল আলোর রশ্মি বাহির হইয়াছিল… সে-আলোর অতি-ক্ষীণ একটু আভাও আর নাই!

পুল পার হইয়া ট্যাক্সি হ্যারিসন রোডের মোড়ে পৌঁছিল। পাঁচতলা একটা বাড়ীর সামনে তিনি ট্যাক্সি দাঁড় করাইলেন।

ট্যাক্সি দাঁড়াইল। নামিয়া রামাবতারকে লইয়া হিমাংশু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নীল আলো

বাড়ী লোকে লোকারণ্য। একতলায় রাজ্যের দোকানা-পশারী দোকান খুলিয়াছে, গুদাম খুলিয়াছে। দোতলাতেও তাই। সেই সঙ্গে কোনোদিকে একটা, কোনোদিকে দুটা, কোনোদিকে বা আধখানা কামরা লইয়া ভাটিয়া, মাড়োয়ারী, পাঞ্জাবী ভাড়াটিয়াদের বাস। হিমাংশু চলিয়াছেন রামাবতারকে লইয়া তাদের ঘর-দ্বার পার হইয়া। তার দিকে কাহারো লক্ষ্য নাই। অর্থাৎ বাড়ী হইলে কি হইবে, এ বাড়ীর সর্বত্র যেন সর্ববিধ লোকের যাতায়াতের অধিকার আছে, এবং সে যাতায়াতের বিরুদ্ধে কাহারো তর্জনী নাড়িয়া নিষেধ তুলিবার এক্তিয়ার নাই।

সিঁড়ির পর সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া হিমাংশু উঠিলেন পাঁচতলার ছাদে। ছাদের খানিকটা খোলা…বাকী-অংশে সার-সার এক-হারা কামরা। এ-সব কামরার কোনোটায় রান্নাঘর; কোনোটায় নীচেকার কোনো ভাড়াটিয়ার সরকার, গোমস্তা বা ভৃত্যের বাস; কোনো কামরায় অল্প ভাড়ার ভাড়াটিয়া আছে।

খোলা ছাদে ক'জন পশ্চিমা লোক বসিয়া তাস খেলিতে-ছিল। হিমাংশু আসিয়া তাদের বলিলেন,—এখানে নীল বাতি কে জ্বেলেছিল?

প্রশ্ন শুনিয়া তারা যে-চোখে হিমাংশুর পানে চাহিল…যেন হিমাংশু মস্ত আজগুবি কথা বলিতেছেন। তা'রা প্রায় সমস্বরে বলিল—নীল বাতি!

হিমাংশু বেশ রুদ্র কণ্ঠে বলিলেন—হাঁ, হ্যাঁ। ন্যাকা সাজছো কেন? বলো, কে নীল বাতি জ্বেলেছিল? না বললে বিপদ হবে।

নীল আলো

বিপদ! তাদের মুখ শুকাইয়া গেল। কোনোমতে একজন লোক বলিল—কতক্ষণ আগে?

হিমাংশু বলিলেন—বিশ-পঁচিশ মিনিট আগে।

সে বলিল—আমরা এই পাঁচ-সাত মিনিট হলো এসেছি। জানিনা···

হিমাংশু বলিলেন—জানো না! বটে! চালাকি পেয়েছো! বিশ মিনিট আগে বাড়ীর ছাদে নীল বাতি জ্বললো···অনেকক্ষণ ধরে জ্বললো···আর তোমরা এই বাড়ীতে থাকো, তোমরা তার কিছু জানো না!

তিনি ডাকিলেন—রামাবতার···

রামাবতার মিলিটারী ভঙ্গিতে সেলাম করিয়া হিমাংশুর সামনে খাড়া হইয়া দাঁড়াইল।

হিমাংশু বলিলেন—এদের গ্রেফ্‌তার করো। করে থানায় নিয়ে চলো।

গ্রেফ্‌তারের কথা শুনিয়া নিমেষে তারা যেন কেঁচো!

হিমাংশু চারিদিকে চাহিলেন···সন্ধানী দৃষ্টি। মনে হইতে-ছিল, সে আলোর উৎস অদৃশ্য হয় নাই, এখনো এইখানে আছে।

হঠাৎ আকাশের বুকে আবার সেই নীল আলোর উচ্ছ্বাস··· খানিকটা দূরে···উত্তর-পূর্ব্ব দিকে।

একজন লোক চীৎকার করিয়া উঠিল,—ঐ আলোর কথা বলছেন বাবু-সাব?

হিমাংশু যেন পাথর বনিয়া গিয়াছেন···এমন গভীর তাঁর বিস্ময়!

ও-আলো কি তাঁকেই সঙ্কেত দিল?

আলো নিমেষে নিবিয়া গেল!

নীল আলো

হিমাংশু ভাবিলেন, ও-আলোর পিছনে এ-রাত্রে কোথায় বা ছুটাছুটি করিবেন?···তিনি চাহিলেন সেই দলটির পানে, বলিলেন,—এ-ছাদেও আমি ঐ আলো দেখেছি।

লোকটা বলিল—তাজ্জব বাত্, বাবু-সাব! এখানে আমরা বাস করছি···কেউ দু চার মাস···কেউ পাঁচ-সাত বছর! এ-বাড়ীতে নীল আলোর কারবার কেউ করে না। আতস-বাজি ফুটোবে, এমন সৌখীন আদমী এ-কুঠিতে নেই।

—কিন্তু ও-আলো?

সে বলিল—জানি না বাবু-সাব। তবে বলেন যদি, সন্ধান নিতে পারি।

হিমাংশু বলিলেন—সন্ধান চাই এবং এখনি।

ছাদের একহারা কামরায় যাদের আস্তানা, তারা তখন তাদের ডাকিল।

গ্রেফ্তারের ভয় দেখাইতেই তারা বাহির হইয়া আসিল।

তাদের জিজ্ঞাসা করিতে তারা বলিল, খানিক আগে তিনজন সাহেবী-পোষাক-পরা লোক ছোট একটা চুঙি লইয়া আসিয়াছিল। আলো জ্বালিতেছিল। আমরা বলিলাম—কিসের আলো? তারা বলিল—বিলাতী বহুৎ নূতন চীজ আসিতেছে···বিজলী-বাতি আসিতেছে, তাই তার প্রচারের জন্য আলোর নিশান তুলিয়া তারা বিজ্ঞাপন জাহির করিতে চায়।

হিমাংশু বলিলেন—তাই যদি তো তারা চলে গেল কেন?

উত্তর শুনিলেন,—এ-জায়গার চেয়ে আরো ভালো জায়গা চাই—এই কথা বলিয়া একটু আগে তারা চলিয়া গেছে।

এ ব্যাপারের এইখানেই শেষ।

নীল আলো

হিমাংশু নিশ্বাস ফেলিলেন। ভাবিলেন, এখন ?

ললাটে কুঞ্চনরেখা…তিনি চিন্তামগ্ন হইলেন। তার চিন্তা ভাঙ্গিল ছাদের সেই লোকটির কথায়। তারা বলিল—ঐ, ঐ নীল রোশ্‌নি…

হিমাংশু চাহিলেন। দেখিলেন, একটু আগে যে-দিকে দেখিয়াছিলেন, তার আরো উত্তরে আকাশের গায়ে তেমনি নীল আলোর ঝলক্‌! আলো এবার চট্‌ করিয়া নিবিল না! এখনো জাগিয়া আছে ও-আলোর আভাস! ও-আলো দোলে না, কাঁপে না, নড়ে না! অবিচল!

হিমাংশু মনে মনে বলিলেন, কোথায় ও আলো? নিমতলা ঘাটে? কিম্বা আরো আগে আহিরীটোলায়?

তিনি আর এক-মুহূর্ত্ত দাঁড়াইলেন না…রামাবতারকে সঙ্গে লইয়া দ্রুতপদে নীচে নামিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আলোয় উদ্‌ভ্রান্ত

ট্যাক্সিতে বসিয়া ড্রাইভারকে বলিলেন—নিমতলা ষ্ট্রীট চলো।

দর্ম্মাহাটার নূতন পথ ধরিয়া ড্রাইভার তার ট্যাক্সি চালাইল। গাড়ীতে বসিয়া হিমাংশু দেখিলেন, আকাশে নীল আলোর আভা। পথের পথিকদের মধ্যে যারা অলস, যাদের কৌতূহল বেশী, তারা চাহিয়া আছে বিস্ময়াকুল নেত্রে ঐ আলোর আভার পানে।

জোড়াবাগান পার্কের কাছে ট্যাক্সি আসিল। সে আলো··· ঐ যে কাছে! নিমতলা ষ্ট্রীটে উত্তর-দিককার ফুটপাথের গায়ে তিন-তলা বাড়ী। আলোর উৎস সে-বাড়ীর ছাদে।

ট্যাক্সিকে সে-বাড়ীর সামনে দাঁড় করাইয়া হিমাংশু বাড়ীর মধ্যে ঢুকিলেন। মেশ-বাড়ী। যাঁরা থাকেন, তারা নানা অফিসে কাজ করেন।

বাড়ীতে ঢুকিতেই একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোক রোয়াকে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। তাঁকে লক্ষ্য করিয়া হিমাংশু বলিলেন—আমি আপনাদের বাড়ীর ছাদে যেতে চাই।

ভদ্রলোক বলিলেন—কেন বলুন তো? আধ ঘণ্টা আগে একদল সিনেমাওয়ালা এসে ছাদে উঠেছে। বললে, ছাদ থেকে তারা নাকি কি ছবি তুলবে।

হিমাংশু ভাবিলেন, বটে!

ভদ্রলোক সিঁড়ি দেখাইয়া দিলেন। হিমাংশু বলিলেন—আপনি ছবি তোলা দেখতে যাননি?

নীল আলো

ভদ্রলোক বলিল—না মশায়···মরি নিজের নানান্ জ্বালায়! ও-সব ফষ্টি-নষ্টি কি ভালো লাগে?

রামাবতারকে সিঁড়ির নীচে পাহারাদারীতে রাখিয়া এবং যথাবিধি উপদেশ দিয়া হিমাংশু সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলেন। দোতলার সিঁড়ি পর্য্যন্ত উঠিয়াছেন, সহসা নীচের-তলা হইতে ভেঁপু বাজিল। কি তীব্র বিকট সে ভেঁপুর শব্দ। হিমাংশু দাঁড়াইলেন না···সোজা তিন-তলায় চলিলেন।

ছাদের সামনে সিঁড়ির মুখে দরজা। সে-দরজা বন্ধ। হিমাংশু দ্বার ধরিয়া ঠেলিলেন, ছাদের দিক হইতে দ্বার বন্ধ। জোরে ঠেলা দিলেন, দ্বার খুলিল না। দ্বারের কাঠ খুব মজবুত নয়। দ্বারে সবলে লাথি মারিলেন, তবু দ্বার খুলিল না। নীচে সে-ভেঁপু এখনো বাজিতেছে···যেন কলের বাঁশী! মনে হইল, সঙ্কেত! নিশ্চয়, তাই! তিনি পুলিশ-অফিসার, নিশ্চয় কেহ অলক্ষ্যে তাঁকে লক্ষ্য করিয়াছে। এবং ছাদে ঐ আলো······ তিনি ছাদে উঠিতেছেন দেখিয়া বাঁশী বাজাইয়া ছাদের শয়তানদের সে সংবাদ জানাইতেছে!

কিন্তু কোথা হইতে এ বাঁশীতে

একটি মাত্র লোককে নীচে দেখিয়া

ভদ্রলোক···নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া তামা

বাজায় নাই! বাজাইতে পারে না।

চকিতে মনে হইল, ছুটিয়া নীচে না

বাঁশী বন্ধ করিবেন না কি? এদিকে ছ

দ্রুত-পায়ে তিনি নামিয়া আসিলে

ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোক

ফিরিয়াছেন। কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়া

ভাঁজিতে নীচে নামিবার উদ্যোগ করিতেছেন, হিমাংশু তাঁকে বলিলেন—একটা হাতুড়ি-টাতুড়ি দিতে পারেন? কিম্বা লোহার রড?

সে-লোকটি কেমন হকচকিয়া গেল। বলিল—কেন বলুন তো?

হিমাংশু সংক্ষেপে বলিলেন—ক'জন বদমায়েস লোক ছাদে উঠে কপাট বন্ধ করে দেছে। নিঃশব্দে আমি তাদের ধরতে চাই। দরজা যদি ভাঙ্গতে হয়, তাই!

লোকটি এ-কথায় বুঝিল ব্যাপার গুরুতর এবং হিমাংশু হয়তো পুলিশের লোক।

সে বলিল—বারান্দায় কয়লা-ভাঙ্গা একটা লোহার মুগুর আছে···দেখুন তো, তাতে হবে কি না। বলিয়া সে মুগুর দেখাইয়া দিল।

বেশ ভারী লোহার মুগুর। হিমাংশু মুগুর লইয়া ছাদের সিঁড়িতে উঠিলেন। লোকটিকে বলিলেন—এ-কথা কাকেও আপনি বলবেন না। সাবধান···

মাথা নাড়িয়া সে জানাইল, বলিবে না···

হিমাংশু উঠিলেন ছাদের সিঁড়িতে। সে-লোক গান বন্ধ করিয়া হতভম্বের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিল, নিজের ঘরে গিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিই। কি জানি, উনি বলিলেন, বদমায়েস লোক ছাদে উঠিয়াছে, তাড়া খাইয়া আত্মরক্ষার জন্য নীচে আসিয়া কি কাণ্ড যে না বাধাইবে! তাদের হাতে যদি পিস্তল-বন্দুক থাকে?

ভদ্রলোক ছুটিয়া নিজের কামরায় ঢুকিয়া ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

হিমাংশু উপরে উঠিয়া ছাদের কপাটে তিন-চার ঘা মুগুর

মারিলেন···বেশ জোরে! কাঠের কপাট সে-আঘাতে ভাঙ্গিয়া গেল। হিমাংশু ছাদে গেলেন।

ছাদে জন-মানবের চিহ্ন নাই! এক-জায়গায় একরাশ শুধু পোড়া ছাই এবং গন্ধকের গন্ধ।

আলিসার উপর ঝুঁকিয়া হিমাংশু চারিদিকে চাহিলেন। ছাদের একদিকে লোহার বাঁকানো সিঁড়ি···নামিয়া গিয়াছে সেই নীচে পর্য্যন্ত। বুঝিলেন, ঐ সিঁড়ি দিয়া পলাইয়াছে।

হিমাংশু সেই লোহার সিঁড়ি দিয়া তখনি নীচে নামিলেন। সিঁড়ির নীচে এঁদো গলি, পচা নর্দ্দামা। নর্দ্দামার গায়ে স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা···দুর্গন্ধে প্রাণ যায়!

সেই গলি দিয়া কোনোমতে খানিকটা পথ আসিবামাত্র নিমতলা ঘাটে পড়িলেন। সামনে ছিল একজন ট্রাফিক-কনষ্টেবল্। তাকে বলিলেন—এ-দিক দিযে কোনো লোককে পালাতে দেখেচো?

এ প্রশ্নে কনষ্টেবলের চোখে প্রথমে ফুটিল প্রচণ্ড বিস্ময়। তারপর সে বলিল—হাঁ বাবু, পাঁচজন লোক গলি থেকে বেরিয়ে একখানা ট্যাক্সিতে চড়ে গঙ্গার দিকে গেছে।

—তাদের চেহারা?

কনষ্টেবল্ বলিল—একজন ছিল সাহেবী-পোষাক-পরা··· বাকী চারজনের মাথায় পাগড়া···মাড়বারী লোকের মতো।

—দেখলে চিনতে পারবে?

—না বাবু।

হিমাংশু বলিলেন—এ-বাড়ীতে তুমি তাদের আসতে দেখেছিলে?

কনষ্টেবল্ বলিল—চল্লিশ মিনিট আগে একটা গোলমাল

হয়েছিল···কুঠী থেকে আদমি এসে আমায় ডেকে নিয়ে যায়। বলে, বাহারকা আদমী কোঠীমে ঘুষা। তাদের কাছে কি-সব যন্তর·········ছবি তোলার যন্তর। তারা বলে, বাইস্কোপের তসবীর বানাবে। তারপর কোঠীর লোকদের থোড়া রূপেয়া দিয়ে বলে, ছাদের ভাড়া লেও। তারপর গোলমাল থামিয়া যায়, হামি লোক হামারা বাট্‌মে চলিয়ে আসি।

হুঁ!···হিমাংশু ভাবিলেন, ভালো চাল চালিয়াছে তো! কিন্তু এমন করিয়া দিকে-দিকে নীল-আলো জ্বালে কেন? কি তাদের মতলব?

হিমাংশু আবার সেই বাড়ীর মধ্যে ঢুকিলেন। ঢুকিয়া লোকজনকে প্রশ্ন করিলেন। উত্তর যা শুনিলেন, ঐ এক কথা!·· মানে, সিনেমার কি ছবি তুলিবে এই কথা বলিয়া ক'জনকে গোটা দশেক টাকা দিয়া পাঁচজন লোক ছাদে উঠিয়াছিল··· বাড়ীর লোকজন আর কোনো খবর জানে না। তাদের চেহারাও এমন মনোযোগ দিয়া কেহ লক্ষ্য করে নাই যে পরে দেখিলে তাদের চিনিতে পারিবে।

হিমাংশু বলিলেন—তোমরা কেন ছবি তোলা দেখতে ছাদে গেলে না?

তারা জবাব দিল—ওরা মানা করলে। বললে, এখন দেখা হবে না। এর পরে হাউসে যখন ছবি দেখানো হবে, পাশ মিলবে, তখন গিয়ে পূরো-ছবি দেখো···

বেশ! কিন্তু ঐ বাঁশী? বাঁশী কে বাজাইল? কোথা হইতে বাজাইল?

কোনোখানে সন্ধান মিলিল না। সকলে বলিল—গলির মধ্য হইতে বাজাইতে পারে তো!

হিমাংশু ভাবিলেন, তা পারে!

এইখানেই এ ব্যাপারের উপর যবনিকা ফেলা ভিন্ন আর উপায় কি!

নিরাশ চিত্তে হিমাংশু বাড়ী ফিরিলেন। ফিরিয়া সাত্যকির গৃহে টেলিফোন্ করিলেন,—সাত্যকি বাবু আছেন?

জবাব মিলিল,—না! তিনি তো আজ দু-তিন বৎসর এখানে নেই।

হিমাংশু কহিলেন—সে কি! আজ তিনি ফিরেছেন তো···হাওড়া ষ্টেশনে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে!

জবাব শুনিলেন—না। তিনি আসেন নি।

হিমাংশু বলিলেন—এলে আমাকে যেন ফোনে খপর দেওয়া হয়! আমার ফোন্-নম্বর পি-কে নাইন্ ফাইভ্ ওয়ান্।

নম্বর দিয়া আবার বলিলেন—খুব জরুরী দরকার আছে। তিনি এলে যেন নিশ্চয় আমার এ-নম্বরে আমাকে ফোন করা হয়।

জবাব,—তিনি যদি না আসেন?

হিমাংশু কি ভাবিলেন, ভাবিয়া বলিলেন—তাহলে ফোন্ করবার দরকার নেই!

বলিয়া ফোন্ ছাড়িয়া দিলেন।

হিমাংশু স্থির করিলেন, সাত্যকি যদি বাড়ীতে না ফেরে, তার সন্ধান···কিন্তু সন্ধানের পূর্ব্বে বাড়ীতে তার হারানোর খপর দিয়া অনর্থক বাড়ীর লোকজনকে উতলা করিবেন কেন?

ললাটে গভীর চিন্তার রেখা···মুখ-হাত ধুইবার জন্য হিমাংশু বাথ-রুমে ঢুকিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এবার দক্ষিণে

হিমাংশুর বুকে চিন্তার পাহাড়। ঐ ভিড়ে-ভরা হাওড়া-স্টেশন—চোখের সামনে হইতে সাত্যকি উবিয়া গেল। ছোট ছেলে নয় যে কেহ ভুলাইয়া লইয়া যাইবে। হাত-পা বাঁধিয়া তাকে বিনা-বাধায় লইয়া যাইবে, তাও হইতে পারে না। সাত্যকি নিজে গিয়াছে—স্বেচ্ছায় গিয়াছে, নিশ্চয়।

কিন্তু গেল কাহার সঙ্গে? এদিকে ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া আছে। ট্রেণে কোনোমতে সময় কাটাইয়াছে। হাওড়ায় নামিবামাত্র হিমাংশুকে ডাকিয়াছে···এত ভয়।

আশ্চর্য্য ব্যাপার।

তারপর ঐ নীল আলো। এ এক নূতন উৎপাত! এবং এ উৎপাতের ধারা এমন যে মানুষে করিতেছে বলিয়া মনে হয় না। হাওড়া-স্টেশনে সাত্যকি আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এ খপর তারা জানে। তাই তাকে ভয় দেখাইবার জন্য তাদের ইঙ্গিতে দলের কোনো লোক হ্যারিসন রোডের মোড়ে ঐ পাঁচতলা বাড়ীর ছাদে উঠিয়া আলো জ্বালিয়াছিল। তার অর্থ বুঝা গেলেও এখানে ঐ নিমতলা-ঘাট ষ্ট্রীটের বাড়ীতে ও-আলো জ্বালিবার কি প্রয়োজন? সহরের এত জায়গা ছাড়িয়া কানাচে ও-রাস্তায় ঐ জীর্ণ বাড়ী···? হেঁয়ালি!

উঁচু ছাদের যদি এত প্রয়োজন, হ্যারিসন রোড ছিল···

চিত্তরঞ্জন এভেনিউ ছিল! সে-পথের কোনো পাঁচতলা ছ'তলা বাড়ীর ছাদে উঠিয়া নীল আলো জ্বালিতে পারিত!

রহস্য!

তাছাড়া এ আলো জ্বালিতেছে কার জন্য? সাত্যকিকে ভয় দেখাইতে? সে পলাইবে, তাই ওরা বলিতে চায় যে কোথায় পলাইবে বাপু? তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও এখানে আসিয়াছি!...যদি তাই হয়, তাহা হইলে আলো-ওয়ালারা কি সাত্যকির উপর লক্ষ্য রাখিয়া এ আলোর ভেল্‌কি দেখাইতেছে? এবং সাত্যকি কি তাহা হইলে হাওড়া ছাড়িয়া আহিরীটোলার দিকে গিয়াছে? কেন? সাত্যকির বাড়ী ভবানীপুরে...সহরের উত্তরাঞ্চলে যাইবার কি তার প্রয়োজন? ...কোনো আত্মীয়-বন্ধুর ওখানে?

অসম্ভব! হিমাংশুকে ডাকিয়া আনিয়া তার কাছে সংক্ষেপে আশঙ্কার কারণ বলিয়া সাত্যকি হিমাংশুর গৃহে হিমাংশুর কাছে থাকিতে চাহিয়াছিল...হঠাৎ দু'দশ মিনিটে সে-মতের এমন পরিবর্ত্তন ঘটিল যে হিমাংশুকে ইঙ্গিতে কোনো খপর না দিয়া হিমাংশুর সঙ্গ ছাড়িয়া সাত্যকি নিরুদ্দেশ হইবে!

সেই জীর্ণ বাড়ীতে সাত্যকি নাই তো? আলোর দল যদি ভুলাইয়া তাকে ঐ বাড়ীতে লইয়া গিয়া থাকে? তা যদি লইয়া যায়, তাহা হইলে নিমতলার বাড়ীর ছাদে ও-আলো জ্বালিবার অর্থ পাওয়া যায় না!

নানা-দিক দিয়া ব্যাপারটির সম্বন্ধে হিমাংশু যত ভাবেন, ততই মন যেন জটিল-আবর্ত্তে নিমগ্ন হয়। সে আবর্ত্ত ছাড়িয়া মনের নিষ্কৃতি-লাভের উপায় নাই!

এমনি চিন্তার গহনে বিভ্রান্ত মন লইয়া রাত্রি প্রায় একটা

বাজিল। হিমাংশু ভাবিলেন, ও চিন্তা আব নয়। ভালো করিয়া ঘুমানো যাক। সুনিদ্রার পর সকালে সুস্থ মন লইয়া আবার এ বহস্য-নির্ণযেব প্রযাস পাইবেন।

সকালে উঠিয়া একটা কথা মনে জাগিল। এই নীল আলোর ইতিহাস জানিবার জন্য লালবাজাবেব ইনফর্মেশন-বিভাগের অধ্যক্ষ ব্যানার্জ্জীকে ফোন করিলেন। ব্যানার্জ্জীকে প্রশ্ন কবিলেন,—আকাশে কাল সন্ধ্যার পব নীল-আলোর খুব 'ব্রাইট্ হেলো' বা আভা দেখেছিলে ?

ব্যানার্জ্জী বলিল—আমি দেখিনি······কিন্তু আমাব ভাই গিযেছিল শ্যামবাজাবের দিকে সিনেমা দেখতে সে বললে, দেখেছে ·আলোটা যেন স্পট্ লাইটের মতো।

হিমাংশু বলিলেন—ঠিক তাই। আমি সে আলোযাব আলো দেখেছি। দেখে বহস্য-নির্ণয করতে গিযেছিলুম ··কিন্তু নিরাশ হযে ফিবেছি।

ব্যানার্জ্জী হাসিলেন। হাসিযা বলিলেন—তোমাব পাগলামি! নতুন কিছু দেখলেই তোমার মনে হয, এ বুঝি বিপদের ষড়যন্ত্র চলেছে কোথায · না ?

হিমাংশু বলিলেন—সে সন্দেহ শতকরা নব্বইটি ক্ষেত্রে কিন্তু সত্য হযে দাঁড়ায, ব্যানার্জ্জী। আলেযার ও আলোর আড়ালে এমনি ষড়যন্ত্রের ছাযা আছে, ভাই। সে-কথা পরে বলবো'খন। কিন্তু এখন আমার জিজ্ঞাস্য···তোমার ক্রাইম্-হিষ্ট্রীতে নীল আলোর সম্বন্ধে কোনো কথা আছে ?

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—ক্রাইম্-হিষ্ট্রীতে !···রোসো ··দেখছি ভেবে···

নীল আলো

ব্যানার্জ্জী দু' মিনিটমাত্র চিন্তা করিলেন। তারপর বলিলেন —মনে পড়েছে। বোম্বাইয়ের দিকে এবং তোমার সেণ্ট্রাল-প্রভিনসেশে নানা টোপি বলে' একজন ডাকাতের সর্দ্দার ছিল। ঠগীদের উচ্ছেদের পরেই তার দলের প্রথম আবির্ভাব হয়… এ-দলের নাম 'টোপিয়া'। এদের দলে বহু লোক…এরা নীল দেবাক্ জ্বেলে সিগনাল করতো। আলো দেখলে দলের লোক বুঝবে, একটা শীকারের আয়োজন চলেছে এবং তখনি যে-অবস্থায় যে থাকবে, তাদের ঐ আলো লক্ষ্য করে আলো-জ্বালাদের দলে গিয়ে জমায়েৎ হতে হবে।…তা ও দল হঠাৎ কলকাতায় এসেছে ব'লে তোমার সন্দেহ হচ্ছে না কি ?

হিমাংশু যেন অনেকখানি আশ্বস্ত হইলেন। বলিলেন—তোমার কথা শুনে নিশ্বাস ফেলতে পারলুম।…সন্দেহের কথা বলচো ? তা ঠিক। সন্দেহ খুব প্রবল…এবং একেবারে অকারণও নয়। একদল যে কলকাতায় এসেছে, তার পরিচয় আমি কাল সন্ধ্যার সময়ে পেয়েছি…এবং তাদের আসবার কারণও আমি খানিকটা জানতে পেরেছি।

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—বলো কি হিমাংশু। সত্যি ?

হিমাংশু বলিলেন—মিথ্যা কেন বলবো, ভাই ?…আচ্ছা, আজ এই পর্য্যন্ত। এর পরে দেখা হলে এ-সম্বন্ধে কথা কবো… বুঝলে।

ব্যানার্জ্জী বলিলেন—বেশ…

ফোন্ ছাড়িয়া হিমাংশু গেলেন স্নান করিতে। স্নান করিতে করিতে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। প্রথমে লালবাজারে গিয়া ডেপুটি-সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ। তারপর…

সাত্যকির গৃহে সাত্যকির সন্ধান করিলেন। সাত্যকি সেখানে নাই। আসে নাই। আসিবে বলিয়া কোনো চিঠিপত্রও বাড়ীতে কেহ পায় নাই। হিমাংশু বলিয়া আসিলেন—তার সম্বন্ধে কোনো খপর পেলে তখনি আমায় জানাবেন। আমার বাড়ীতে ফোন্ করবেন…আমি যদি না থাকি, বলবেন, খপর আপনারা যা দেবেন, সে-খপর যেন আমার বাড়ীর লোকজন লিখে রাখে।

দারুণ দুশ্চিন্তায় সাত্যকির বাড়ীর লোকজন বলিল—কিছু হয়েছে না কি? কোনো বিপদ?

হিমাংশু মিথ্যা কথা বলিলেন। বলিলেন—না, বিপদ নয়। যে কাজে তিনি গেছেন, সেই কাজ সম্বন্ধেই কথা ছিল। তাছাড়া ক'দিন আগে সাত্যকি আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে, আজ-কালের মধ্যে তার কলকাতায় ফেরবার সম্ভাবনা আছে।

এ কথা বলিয়া তিনি আসিলেন সেই নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটের বাড়ীতে। প্রত্যেক ঘর সার্চ্চ করিলেন…প্রত্যেকটি লোককে ডাকিয়া নানা প্রশ্ন করিলেন। কোথাও সাত্যকির সন্ধান পাইলেন না। বাড়ীর লোক স্পষ্ট বলিল, এ-বাড়ীতে এক মাসের মধ্যে কোনো নূতন লোক আসে নাই।

তখন তিনি গেলেন হ্যারিসন রোডের সেই বাড়ীতে। সেখানেও জোর-তদন্ত করিলেন। যে-ক'জন লোক সন্ধ্যার পর আলো জ্বালিয়াছিল, তাদের কেহ এখানে থাকে না। তারা এখন এ-বাড়ীর কোথাও নাই। কেহ তাদের এ-বাড়ীতে পূর্ব্বে দেখে নাই।…

ট্যাক্সিওলাদের মধ্যে যে-ক'জনকে পাইলেন, নানা প্রশ্নে জর্জ্জরিত করিলেন—কোনো গাড়ী হাওড়া হইতে পুরুষ

সওয়ারি লইয়া সন্ধ্যার পর নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটের দিকে গিয়াছিল কিনা! ও-অঞ্চলের প্রতি ষ্ট্যাণ্ডে সন্ধান করিলেন; হাওড়া-ষ্টেশনের ষ্ট্যাণ্ডে সন্ধান লইলেন…রহস্যের বিন্দু-বাষ্প কাহারো কাছ হইতে পাওয়া গেল না।

ঘুরিয়া এই সব তদন্ত করিতে সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া আসিল। হিমাংশু আসিয়া ঢুকিলেন এসপ্লানেডে একটা হোটেলে। পিপাসায় কণ্ঠ-তালুতে যেন ছুঁচ বিঁধিতেছে……এমন জ্বালা! হিমাংশু আসিয়া বয়কে বলিলেন—চা…

বয় চা আনিয়া দিল। হিমাংশু বসিয়া চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করিলেন। তারপর দাম দিয়া বাহিরে আসিলেন।

ফুটপাথে লোকের ভিড়। লোকজন হাঁ করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। তাদের দৃষ্টি দক্ষিণ-মুখী অর্থাৎ ভবানী-পুরের দিকে। সকৌতূহলে হিমাংশু সেইদিকে চাহিলেন।

চাহিয়া যাহা দেখিলেন, তাঁর কেশ কণ্টকিত হইয়া উঠিল! ভবানীপুরের দিকে আকাশে সেই উজ্জ্বল নীল আলোর আভা! ……যেন আকাশের বুকে কে উজ্জ্বল নীল কালির দোয়াত উপুড় করিয়া দিয়াছে! দিয়া সেই নীল কালির উপর বৈদ্যুতিক আলো ফোকাশ করিয়াছে!

হিমাংশুর ভ্রূ কুঞ্চিত হইল…কোথায় ও আলো? অনুমান করিলেন, বিজ্জিতলার গির্জ্জার একটু ওদিকে……হয় হরিশ মুখার্জ্জী রোডে, না-হয় আশুতোষ মুখার্জ্জী রোডে!

তিনি আর এক-মিনিট দাঁড়াইলেন না। সামনে যে খোলা ট্যাক্সি পাইলেন, তাহাতে চড়িয়া বসিলেন, বলিলেন—ভবানীপুর …জল্‌দি…জোরসে চলো…

চৌরঙ্গী ধরিয়া ট্যাক্সি নক্ষত্রবেগে ছুটিল ভবানীপুরের দিকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কুলির মাথায় লগেজ

ট্যাক্সি আসিল হরিশ মুখার্জ্জী রোডের মোড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আকাশের বুকে সে নীল আলো মিলাইয়া অদৃশ্য হইল। পথে পথিকের দল বিমূঢ়ের মতো দাঁড়াইয়া ছিল। আলোর পানে চাহিয়া অনেকে পথ-চলা যেন ভুলিয়া গিয়াছিল। এখন আলো নিবিতে সকলের চেতনা জাগিল···আবার সকলে চলা সুরু করিল।

হিমাংশুর ট্যাক্সি আসিল শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীটের মোড়ে। ডান দিকে ছোট একটি মসজিদ। তার ঠিক উত্তরে দোতলা বাড়ী···সামনে ফটক। ফটকের বাহিরে বহু লোক দাঁড়াইয়া আছে। ট্যাক্সি হইতে নামিয়া তাদের লক্ষ্য করিয়া হিমাংশু প্রশ্ন করিলেন—একটু আগে আকাশে আলো দেখেছিলে ?

দু'তিনজন লোক সমস্বরে জবাব দিল। বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ···এইমাত্র সে আলো নিবলো।

—কোন্‌দিকে জ্বলেছিল, বলতে পারো ?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ···একটু আগে কাশারিপাড়ার গলি······সেই গলিতে। আমাদের এখান থেকে দু'তিনজন লোক দেখতে গিয়েছিল। একজন ফিরে এসে বললে, কাঁশারিপাড়ায় একটা বড় বাড়ীর ছাদে বায়োস্কোপের ছবি নেওয়া হবে, না, কি হবে···তার আলো !

—হুঁ। বলিয়া হিমাংশু তাদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—আপনারা কেউ আসবেন আমার সঙ্গে? মানে, আমার এই ট্যাক্সিতে?

তাহাদের মধ্য হইতে একজন লোক আগাইয়া আসিল। হিমাংশু তাকে ট্যাক্সিতে তুলিলেন। পশ্চিমে বাঁকিয়া ট্যাক্সি আসিল কাঁশারিপাড়া রোডের মোড়ে। ও পথে কি ভিড়… নানা মন্তব্য তুলিয়া সকলে তর্ক করিতেছে।

যে-লোকটিকে হিমাংশু ট্যাক্সিতে তুলিয়াছেন, তার নাম সুদর্শন। সুদর্শন প্রশ্ন করিল—কি দেখলেন বাবু?

বাবুরা বলিল—নীল আলো! উঃ, কি জোরালো আলো!

পাশ দিয়া কে টিপ্পনী কাটিয়া গেল—হুঃ, এ কি জোর! জোরালো নীল আলো দেখেছিলুম বটে সেবারে সেই গড়ের মাঠে! তোমার মনে আছে শ্রীনিবাস? সেই সেবারে যখন প্রিন্স অফ্ ওয়েল্‌স্ এসেছিলেন কলকাতায়…

এমনি নানা মন্তব্য করিয়া কত লোক ছত্রভঙ্গ হইয়া ফিরিতেছে, সংখ্যা নাই।

সুদর্শন আবার প্রশ্ন করিল—কোন্ বাড়ীতে আলো হলো?

একজন বলিল—এখন আর বাড়ী দেখে কি করবে বাপু? আলো থাকতে এলে না কেন? তখন এলে দেখতে বটে, হ্যাঁ, আলোর মত আলো!

এ-কথায় হিমাংশু প্রশ্ন করিলেন—কি ব্যাপার হলো, বলুন তো!

যে-লোকটা এ-কথা বলিয়াছিল, সে জবাব দিল না; জবাব দিল আর একজন। এ-লোকটি বলিল—কি আবার হবে মশায়! পর্ব্বতের মূষিক প্রসব! সবাই বলে—হ্যানা

হবে তা না হবে···ওমা, কিচ্ছু না! আলো জ্বললো···তারপর সে আলো নিবলো···বাস্!

হিমাংশুর মনে ক্ষীণ আশা! হিমাংশু বলিলেন—কারা সে আলো জ্বাললে, জানেন?

সে বলিল—আলো জ্বালতে দেখিনি মশাই! কে জ্বেলেছে, তাও দেখিনি···ঐ আলোই শুধু জ্বলতে দেখেছি। এসো হে নিবারণ!

হিমাংশু ট্যাক্সি দাঁড় করাইলেন। সঙ্গে সুদর্শনকে বলিলেন—তুমি সঙ্গে আসবে?

সুদর্শন বলিল—যদি বলেন, হাঁ।

—তবে এসো।

ভিড় ঠেলিয়া দ্রুতপায়ে হিমাংশু আসিলেন সেই বাড়ীর সামনে। এই বাড়ীর ছাদেই আলো জ্বলিয়াছিল। বাড়ীর সামনে লোকজন তখনো ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

হিমাংশু প্রশ্ন করিলেন—এটা কার বাড়ী, মশায়?

সুদর্শন জবাব দিল। বলিল—এ-বাড়ী হলো হিলগে-ডাঙ্গার জমিদার বাবুদের। তারা তো এখানে থাকেন না। গোমস্তা-নায়েবরা আছেন বাইরের দিকে। ভিতর-বাড়ী প্রায় খালি থাকে।

হিমাংশু বলিলেন—তুমি এত খপর কি করে জানলে?

সুদর্শন বলিল—আজ্ঞে, এ-বাড়ীতে আমি ছ' মাস চাকরি করে গিয়েছি···আমার দেশের লোক এখানে কাজ করতো···সে ছুটী নিয়ে বাড়ী গেলে তার বদলিতে।

—ও···তাহলে চলো তো বাপু সুদর্শন, গোমস্তাবাবুদের যদি পাও, ছাখো তো···

সুদর্শন বলিল—আপনি আসুন না ভিতরে। নায়েববাবুর নাম হলো জগদীশবাবু। খুব ভালো লোক তিনি।

হিমাংশু বলিলেন—চলো···

হিমাংশু ভাবিলেন, সুদর্শন লোকটি মন্দ নয়। তার উপর এ-বাড়ীর সঙ্গে তার পরিচয় আছে···ভালোই হইয়াছে···

সুদর্শনের মারফৎ নায়েব জগদীশবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। আলোর কথা জিজ্ঞাসা করিতে তিনি বলিলেন—দেখুন না মশায়···ঐ জংলী ভূত মনসা চাকরের কাণ্ড!

হিমাংশু বলিলেন—আপনার সে মনসা-ভূতটি আছে এখানে?

জগদীশবাবু বলিলেন—আছে বৈ কি। কোথায় সে যাবে আবার? বাবুদের সখের চাকর···কাজ নেই, কর্ম্ম নেই··· গড়িয়ে আয়েস করে দিন কাটাচ্ছে!

এইটুকু মন্তব্য করিয়া তিনি ডাকিলেন—মন্‌সা···ওরে এই মন্‌সা···

ভিতর-বাড়ী হইতে সাড়া জাগিল—বাবু···এবং মনসা আসিল।

হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। কালো রঙ···গায়ে জালি গেঞ্জি···মাথার চুল ছোট-বড় করিয়া ছাঁটা···সামনের দিকটা যেন বুলবুলির ঝুঁটি। সে ঝুঁটিতে এলবার্ট-টেরি কাটা।

জগদীশবাবু বলিলেন—তোমার সে বন্ধুগুলি গেছে?

—বন্ধু!

মনসা যেন আকাশ হইতে পড়িল। বলিল—বন্ধু নয়। বাইসকোপের লোক। আমাকে বললে, তোমাদের বেশ উঁচু ছাদ···ওখান থেকে আমরা চারদিককার ছবি তুলবো।··· আমি বললুম, আমার পাশ চাই···পাশ না দিলে ছাদ দেবো না।

হিমাংশু বলিলেন—দেছে তোমায় পাশ ?

—হ্যাঁ। পাশ না নিয়ে কি আর আমি খান্‌কা ছাদে যেতে দিছি, বাবু!

—কৈ, দেখি পাশ।

ট্যাঁক হইতে মনসা বাহির করিল দুটো পোড়া বিড়ি আর একটা দেশলাইয়ের বাক্স। দেশলাইয়ের বাক্সে লাল-রঙের এক-টুকরা ভাঁজ-করা কাগজ। সে কাগজ খুলিয়া হিমাংশু দেখিলেন, তাহাতে লেখা আছে ইংরেজী অক্ষর T এবং সেই সঙ্গে আরো কতকগুলা কি হিজিবিজি লেখা।

হিমাংশু বলিলেন—তোমায় ঠকিয়ে গেছে, বাপু! এ পাশ নয়। এ হলো···

তখনি মনে মনে গল্প বানাইয়া হিমাংশু বলিলেন—ভাঁতের কাপড়ের এগজিবিশন হয়ে গেল না সেদিন···এ সেই এগজিবিশনের টিকিট। এতে লেখা আছে T. তার মানে, তাঁত!

এ-কথা শুনিয়া মনসার চোখ দুটো যেন ঠেলিয়া বাহির হইবে। সে একেবারে হতভম্ব!

হিমাংশু বলিলেন—ক'জন লোক এসেছিল ?

—তিনজন।

—একজন সাহেবী পোষাক-পরা ? একজনের মুখে গোঁফ ···খোট্টাগোছ চেহারা ?

—হ্যাঁ, বাবু···

হিমাংশু বলিলেন—জানি। ওরা হলো এক নম্বরের জোচ্চোর···চুরি ওদের পেশা। ছবি তুলছি বলে' বড় লোকদের

নীল আলো

বড় বাড়ীর ছাদে উঠে সব খপর নেয়···তারপর সুবিধা বুঝে চুরি করে।

এ-কথা শুনিয়া মনসার মুখ শুকাইয়া যেন আম্‌সী!

হিমাংশু বলিলেন—যাক, কিন্তু খুব সাবধান! আর কখনো যাকে-তাকে বাড়ীর মধ্যে এনো না···বিপদে পড়বে, বাপু। ভালো মানুষের ছেলে···বিদেশে চাকরি করতে এসেছে।!

মনসা বলিল—না বাবু···এই নাকে-কাণে খৎ। আবার?

মনসা নিজের হাতে নিজের নাক-কাণ মলিল।

হিমাংশু বলিলেন—আচ্ছা, তুমি যাও। সাবধানে থেকো··· দোরতাড়া বন্ধ করে হুঁশিয়ার থাকবে···বুঝলে?

মাথা নাড়িয়া মনসা নিঃশব্দে চলিয়া গেলে জগদীশবাবুকে একান্তে ডাকিয়া হিমাংশু পরিচয় দিলেন, বলিলেন—এই একদল বদমায়েস ছবি-তোলার নাম করিয়া সহরে উৎপাত সুরু করিয়াছে। সংবাদ পাইয়া তাই তিনি আসিয়াছেন তাহাদের সন্ধানে···

এবং কথায়-কথায় বাবুর পরিচয় লইলেন। কর্তার নাম প্রমথ চৌধুরী। তিনি করেন জয়েলারীর কারবার। জমিদারী আছে রাজসাহীর ওদিকে। ঐ জুয়েলারী কারবারের জন্য যান না এমন জায়গা দুনিয়ায় নাই! সে বৎসর গিয়াছিলেন জাভায়। তার আগে একবার চীনে। ঘুরিতে ঘুরিতে দুম্ করিয়া কবে কলিকাতায় আসিবেন, ঠিক নাই। এ জন্য এখানকার বাড়ী-ঘর কেতা-মাফিক্ রাখা চাই বারো মাস···বামুন-চাকর আছে···মাহিনা-করা। অর্থাৎ অনুষ্ঠানে কোনো ত্রুটি নাই!

পরিচয় লইয়া হিমাংশু বিদায়ের জন্য উদ্যত হইলেন। হঠাৎ মনে পড়িল, সেই সুদর্শন···

বলিলেন—আমার সঙ্গে যে-লোকটি এসেছিল?

জগদীশবাবু বলিলেন—সুদর্শন। সে নিশ্চয় ঠাকুরের কাছে জুটে এক পেয়ালা চা খেয়ে নিচ্ছে।

হিমাংশু বলিলেন—আচ্ছা, আমি তাহলে আসি।

তিনি গৃহ-ত্যাগে উদ্যত হইলেন। কিন্তু মনে যেন পাথরের ভার। মন বলিতেছিল, ওরা কলিকাতা সহরে এত পাড়া এবং এত বাড়ী থাকিতে হঠাৎ আজ সন্ধ্যার পর ভবানীপুরের কাঁশারিপাড়া রোডে এ-বাড়ীর ছাদে আসিয়া এ-আলোর সঙ্কেত দিল কেন? নিশ্চয় এ-সঙ্কেতের অন্তরালে আছে কোনো নিগূঢ় অভিসন্ধি।

কি সে অভিসন্ধি?

এমন চিন্তায় ভারী মন লইয়া হিমাংশু আসিলেন সদরের ফটকে। বাড়ীর পাশে লোহার উঁচু রেলিঙে-ঘেরা বাগান। বাগানে কলা, আম, জাম, লিচু, বেল, বাতাবি লেবু ও নারিকেল গাছের ফাঁকে-ফাঁকে রঙীন বাহারি-পাতার গাছ। মস্ত ঝাঁকড়া একটা জবা ফুলের গাছ আছে। পঞ্চমুখী জবা। ফুলের ভারে রাঙা হইয়া আছে। সে ফুলের গায়ে পথের গ্যাসের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। বাগানের ধারে পথের উপরে ট্যাক্সি···হিমাংশু ট্যাক্সিতে চাপিবার জন্য পা বাড়াইলেন···জগদীশবাবু ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিলেন···

জগদীশবাবুর কথা হিমাংশুর মনে পড়িল। জগদীশবাবু বলিলেন, তার মনিব প্রমথ চৌধুরী মহাশয় জমিদার হইলেও জুয়েলারীর কাজ করেন। এবং এ-কাজের জন্য দুনিয়ায় হেন স্থান নাই, যেখানে তিনি যান না।···এ-আলোর সঙ্গে ঐ জুয়েলারীর কারবারের কোনো সম্পর্ক নাই তো?

সঙ্গে সঙ্গে সাত্যকির কথা মনে পড়িল···সেণ্ট্রাল-প্রভিন্সেশে গিয়া মণি-রত্নে-ভরা গুহা দেখিয়াছিল। তারপর···

সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া মৃদু শিহরণ! হিমাংশু চাহিলেন জগদীশ-বাবুর পানে, বলিলেন—আচ্ছা, প্রমথবাবু কলকাতার এ-বাড়ীতে শেষ কবে এসেছিলেন?

জগদীশবাবু বলিলেন···গেল শ্রাবণ মাসে।

শ্রাবণ মাস! আর এখন ফাল্গুন মাস চলিয়াছে! মাঝে ছ'মাসের ব্যবধান!

প্রশ্ন করিলেন—এর মধ্যে তাঁর কোনো চিঠি পেয়েছেন? মানে, কোথায় তিনি আছেন?

জগদীশবাবু বলিলেন—না। তিনি চিঠি-পত্র লেখেন খুব কম।

—এখানকার কাজ দেখাশোনা? দেশের জমিদারী দেখা—এ-সব কে করে?

জগদীশবাবু বলিলেন—ম্যানেজার আছেন কান্তিবাবু··· রিটায়ার্ড ডেপুটি···তিনি এখানে এবং দেশে সববদা সব দেখাশোনা করেন। জয়নগরের দিকেও বাবুর কিছু জমিদারী আছে। আমরা ক'জন এখানে থাকি। দেশে অন্য নায়েব-গোমস্তা আছেন। তার উপর ত্রিপুরাবাবু আছেন। তিনি হলেন বড় নায়েব···আমি ছোট।

হিমাংশু বলিলেন—হুঁ···একটা কথা বলে যেতে চাই। আপনার মনিব এখানে থাকুন আর নাই থাকুন, আমার সন্দেহ হচ্ছে, এ-দল নিশ্চয় কোনো ফন্দী নিয়ে নিঃশব্দে আজ আপনাদের ছাদে উঠেছিল। আপনারা বেশ একটু সাবধানে থাকবেন। দরকার বোঝেন, আমাকে ফোন্ করবেন···আমার ফোন্ নম্বর দিয়ে যাচ্ছি।

নীল আলো

এই কথা বলিয়া হিমাংশু এক-টুকরা কাগজ আনাইয়া, তাহাতে নিজের ফোন্-নম্বর লিখিয়া সে-কাগজ দিলেন জগদীশবাবুর হাতে। দিয়া তিনি ট্যাক্সিতে চড়িলেন। ড্রাইভারকে বলিলেন—নন্দন রোড···

কাছেই নন্দন রোড। নন্দন রোডে হিমাংশুর বাড়ী।

হিমাংশু বাড়ী আসিলেন। বাহিরের ঘরের ঘড়িতে ঢং-ঢং করিয়া তখন ন'টা বাজিতেছে।

ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিয়া বাহিরের ঘরে পা দিয়াছেন, টেলিফোন্ বাজিল। হিমাংশু রিসিভার লইলেন, কহিলেন—ইয়েস্···হ্যাঁ, আমি হিমাংশুবাবু। ও···সাত্যকিবাবুর ওখান থেকে বলছেন। সাত্যকিবাবু এসেছেন?···আসেননি?···তার লগেজ এসেছে? শুধু একটা সুটকেশ আর বিছানা?···আনলে কে?···একটা কুলি! এইমাত্র?···কোনো চিঠিপত্র সঙ্গে আছে? ···নেই? আশ্চর্য্য কথা তো! কুলি বললে, ট্রাম-রাস্তার মোড়ে একজন বাবু তার মাথায় মোট চাপিয়ে সঙ্গে এসে বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে চলে গেছে···কুলির ভাড়া সে আগে চুকিয়ে দেছে! ···আশ্চর্য্য···আচ্ছা, আমি এখনি যাচ্ছি···ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ···মুখে-হাতে জল দিয়ে রুটি খেয়ে নেবো শুধু···

রিসিভার ছাড়িয়া হিমাংশু আহার করিতে বসিলেন।

পাশের বাড়ীতে গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজিতেছিল,

> লগনা কি শেষ না হোলো,
> এ যে নূতন খেলা!

নিশ্বাস ফেলিয়া হিমাংশু ভাবিলেন, এ গান যেন তাকে উদ্দেশ করিয়া গাহিতেছে! তার সঙ্গে ঐ নীল আলোর যেন নূতন রকমের খেলা সুরু হইয়াছে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আবার মানুষ গায়েব

সাত্যকির গৃহ হইতে হিমাংশু যখন বাড়ী ফিরিলেন, রাত তখন বারোটা বাজে। সাত্যকির লগেজ আসিয়াছে···সাত্যকি আসে নাই! ও-লগেজ হিমাংশুর চেনা। হাওড়া ষ্টেশনে সাত্যকির সঙ্গে দেখিয়াছিলেন এই স্টুটকেশ আর বিছানা··· হাঁ, তাই! তবে একটু বিশেষত্ব আছে। ও-দুটির গায়ে এখন লাল কাগজ আটা এবং সে কাগজে সেই ইংরেজী হরফ T. তার সঙ্গে কতকগুলা হিজিবিজি। কাঁশারিপাড়ার বাড়ীতে সৌখীন-ভৃত্য মনসার কাছে সিনেমার সেই পাশে যেমন হিজিবিজি লেখা দেখিয়াছেন, হুবহু তেমনি হিজিবিজি!

সাত্যকির ছোট ভাই প্রত্যুম্ন। প্রত্যুম্নর সামনে স্টুটকেশ খুলিলেন। চাবি ছিল না। বহু কৌশলে স্টুটকেশ খোলা হইল। স্টুটকেশের মধ্যে জামা-কাপড়; আর একটা নোট-বুকের মধ্যে পাঁচখানা দশ টাকার নোট। সব ঠিক আছে। বাড়তির মধ্যে শুধু স্টুটকেশের ভিতরে তেমনি একখানা T লেখা লাল কাগজ!

বুঝিলেন, স্টুটকেশ যে বা যারা পাঠাইয়াছে, সে বা তারা এ স্টুটকেশ খুলিয়াছিল! খুলিয়া টাকা লয় নাই, তারি সার্টিফিকেট-স্বরূপ যেন এই লাল কাগজ গুঁজিয়া দিয়াছে!

তা যেন দিল, কিন্তু সাত্যকির গৃহে এগুলা পাঠাইবার কি

প্রয়োজন হইল ? সাত্যকি পাঠায় নাই নিশ্চয়। সে পাঠাইলে অন্ততঃ একখানা চিঠি লিখিয়া ইহার মধ্যে গুঁজিয়া দিত। লিখিত, চিন্তা করিয়ো না; দু-এক দিনের মধ্যে আসিব। নিজে না লিখিলেও…অর্থাৎ আর কাহারো আদেশে এমন চিঠি লিখিলে মোটেই আশ্চর্য্য হইত না।

কিন্তু তেমন চিঠি নাই। কোনো চিঠি নাই!

এগুলা পাঠাইবার অর্থ ? যদি বলিত, লগেজ পাঠাইলাম… বুঝিতে পারিতেছ তো যে-লোকের লগেজ, সে-লোক আমাদের কবলে…তার মুক্তি যদি চাও, পাঠাও তবে অমুক ঠিকানায় কাল বেলা ছটার মধ্যে পাঁচ-হাজার কি দশ হাজার টাকা! …ডিটেকটিভ-নভেলে যেমন পড়া যায়! তাও নয়! তবে ?

সাত্যকি সেই যে চুণী-পান্নার কথা বলিয়াছিল…বলিয়াছিল নমুনা আনিয়াছে এবং কুবেরের ধন-ভাণ্ডারের সন্ধান পাইয়াছে …সে চুণী-পান্না কাড়িয়া লইতে পারে তো!

কিম্বা তার চেয়েও ভয়ঙ্কর ব্যাপার…সাত্যকি সে মণি-রত্নের সন্ধান জানিয়াছে! আলিবাবা সেই চল্লিশজন দস্যুর ভাণ্ডার লুঠ করিয়াছিল,…সেই আলিবাবার মতো সাত্যকি পাছে ও ভাণ্ডার লুঠ করিয়া ফাঁক করিয়া দেয়, তাই তাকে কয়েদ করিয়া রাখিবে! কিম্বা প্রয়োজন বুঝিলে প্রাণ-নাশ…

হিমাংশু শিহরিয়া উঠিলেন! সাত্যকিকে যদি প্রাণে মারে, তার পূর্ব্বে কোনো রকম সর্ত্ত…

নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় এ-সব দুর্বৃত্তের মনস্তত্ত্ব হিমাংশু এযাবৎ যেটুকু জানিয়াছেন, তাঁর ধারণা, ইতর হীন চোর-ডাকাতের মতো ইহারা চট্ করিয়া কাহাকেও প্রাণে মারে না। যাঁরা মাছ ধরিতে পটু, তাঁরা যেমন ছিপে মাছ

নীল আলো

গাঁথিতে পারিলে সে-মাছকে জলে বেশ খানিকক্ষণ খেলাইয়া আনন্দ উপভোগ করেন, এ-সব দুর্বৃত্ত শীকারীও বন্দীকে লইয়া তেমনি নানা-রকমের খেলা করে। সাত্যকিকে লইয়া যদি এদেরো তেমনি খেলার বাসনা জাগিয়া থাকে ?

চিন্তায় কোনো হদিশ মিলিল না। তবে এটুকু বুঝিলেন, ডিটেকটিভ-চাকরিতে এযাবৎ যত ফন্দী-অভিসন্ধির মূল ফাঁশাইয়া দুর্বৃত্তদের কায়দা করিয়া আসিয়াছেন, এ নীল আলোর দলকে লইয়া তত সহজে মুক্তি পাইবেন না। ইহাদের দলে কত লোক আছে···কোথায় ইহাদের আস্তানা···কি ইহাদের লক্ষ্য···এ-সব সংবাদ তাঁর সম্পূর্ণ অজানা। এবং কোন্ দিক দিয়া সাত্যকির সন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা নির্ণয় করা সহজ নয়। তাছাড়া কোথায় কোন্ বাড়ীর ছাদে উঠিয়া ইহারা নীল আলোর চমক্ লাগাইবে, তার কোনো স্থিরতা নাই। উপর্যুপরি দু'দিনে এ-আলোর যে চকিত-চমক দেখিয়াছেন··· তাহাতে হিমাংশু বুঝিয়াছেন, এ-দলটির গতি-বিধি এত সতর্কিত যে আগে হইতে তার কোনো হদিশ মেলে না।

সাত্যকির সম্বন্ধে তার বাড়ীতে তেমন আশা না দিতে পারিলেও হিমাংশু বলিয়া আসিলেন—কাল থেকে এ-কাজে লাগবো, প্রদ্যুম্নবাবু। তবে আমার মনে হয়, চট্ করে প্রাণে মারবে না। তা যদি করতো, তাহলে স্যুটকেশের সঙ্গে সে-সঙ্কেত আসতো। দেখা যাক চেষ্টা করে···ফলাফল ভবিষ্যতের গর্ভে।

সে-রাত্রিটা হিমাংশুর একরূপ অনিদ্রায় কাটিল। সকালে উঠিয়া তিনি বাহিরের ঘরে আসিলেন। বেয়ারা চা আনিয়া

দিল। সরকারী এ-এস্-আই গুণময় আসিয়া বলিল—খপরের কাগজ দেখেছেন স্যর ?

হিমাংশু চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন—কেন বলো তো গুণময় ?

গুণময় বলিল—এই দেখুন স্যর, আশ্চর্য্য নীল আলো বলে হেডিং...

গুণময়ের কাছে ছিল খপরের কাগজ; হিমাংশুকে দিল। হেডিং দেখিয়া হিমাংশু পড়িলেন।

কাগজে লেখা আছে—

আশ্চর্য্য নীল আলো

কলিকাতা সহরে কাল এক আশ্চর্য্য রকম নীল আলোর লীলা দেখা গিয়াছে। সন্ধ্যার একটু পরে ভবানীপুর কাঁশারিপাড়া রোডের এক বাড়ীর ছাদ হইতে কাহারা উজ্জ্বল নীল আলোর রশ্মিপাতে সারা আকাশ নীলাভ করিয়া তুলিয়াছিল। হাজার হাজার নীল বাল্‌বে বৈদ্যুতিক আলোর মালা জ্বলিলে তার যে রশ্মিচ্ছটা আকাশে দেখা যায়, এ ছটাও ঠিক তেমনি। দশ-পনেরো মিনিট কাল এ আলোর আভা আকাশ পটে দোদুল্যমান দেখা গিয়াছিল। তারপর রাত্রি সাড়ে-দশটায় শেয়ালদার ওদিকে বেলিয়াঘাটায় ঐ নীল আলোর উজ্জ্বল বিকাশ দেখা যায়। এবারেও এ আভা আকাশে ছিল প্রায় পনেরো মিনিট। তারপর রাত্রি তিনটার সময় ঐ নীল আলোর উজ্জ্বল আভায় শ্যামপুকুরের আকাশ প্রদীপ্ত হইয়া ওঠে।

এ-আলোর আকস্মিক আবির্ভাবে সহরের জন-সাধারণের মনে ভয়ের সীমা নাই। নানা-জনে নানারূপ কল্পনা করিয়া এত বেশী সন্ত্রস্ত হইয়াছে যে পুলিশ কমিশনার এ-রহস্যের মীমাংসা-কল্পে

সম্বব যদি মনোযোগী না হন, তাহা হইলে সহবে বিপুল বিপর্য্যয়
কাণ্ড ঘটিতে পাবে বলিয়া আমাদেব আশঙ্কা আছে।

সংবাদ পড়িয়া হিমাংশু চাহিলেন গুণময়ের দিকে। বলিলেন
—এ আলো তুমি দেখেছো গুণময় ?

—দেখেছি স্যর। কাল আমার নেমন্তন্ন ছিল মির্জ্জাপুর
ষ্ট্রীটে। রাত সাড়ে-দশটার সময় খাওয়া-দাওয়ার পর বাসে
উঠবো বলে সার্কুলার রোডে এসে দাঁড়িয়েছি,হঠাৎ লোকজনের
ছুটোছুটির সমারোহ দেখে আকাশের দিকে চেয়ে দেখি, আকাশ
নীলে নীল! আমি এলুম শেয়ালদা ষ্টেশনের সামনে, আলোও
অমনি মিলিয়ে গেল! ভাবলুম, কোথায় বুঝি বাজি পোড়াচ্ছে,
বাজির দরুণ ঐ আলোর হল্‌কা।

হিমাংশু বলিলেন—বাজির হল্‌কা নয় গুণময়। এ আলো
আমি দেখেছি পরশু দু'বার। কাল একবার। এবং জানতে
পেরেছি, এ আলো জ্বালছে একদল নতুন-রকমের শয়তান এসেছে
সহরে কু-অভিসন্ধি নিয়ে, তারা। তাদের কাজ সুরু হয়ে গেছে
এবং আমি সে-কাজে ইতিমধ্যে জড়িয়ে পড়েছি।

হিমাংশুর কথা শুনিয়া বিস্ময়ে গুণময়ের দু'চোখ বিস্ফারিত
হইল। গুণময় বলিল—লোকে যে আপনাকে বলে পুলিশ-
লাইনে সব্যসাচী···সে কথা ঠিক।

হিমাংশু বলিলেন—সত্যি গুণময়, ব্যাপার খুব সঙ্গীন।
আজ পর্য্যন্ত ভগবানের আশীর্ব্বাদে আর তোমাদের সাহায্যে
অনেক জটিল মিষ্ট্রীর সমাধান করেছি আমি···কিন্তু এ-মিষ্ট্রী···
আমার মনে হয় কোনো গল্পে-উপন্যাসেও এরকম মিষ্ট্রীর
পরিচয় পাইনি।

গুণময় নির্ব্বাক বসিয়া রহিল।

··পিছন হইতে পিছমোড়া করিয়া সজোরে কে তাঁকে ধরিয়া ফেলিল।

—[illegible] পৃষ্ঠা।

নীল আলো

ও-দিকে টেলিফোন্ বাজিল। গুণময় গিয়া রিসিভার ধরিল, বলিল—হ্যা, বলুন···আমি তার এ্যাসিস্টাণ্ট গুণময়। ভবানীপুর থানার অফিসার আপনি? ও···পঞ্চাননবাবু! বলেন কি স্যর? আচ্ছা, আমি তাকে বলছি। আপনি ধরে থাকুন।

রিসিভার হাতে লইয়া গুণময় বলিল—আপনি শুনুন স্যর, কে জমিদার নাকি তার বাড়ী থেকে Vanish হয়েছেন!

—জমিদার Vanish! বলিয়া আকুঞ্চিত ললাটে হিমাংশু গিয়া রিসিভার ধরিলেন। এবং যে-সংবাদ পাইলেন, তাহাতে তার সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ ফুটিল। অর্থাৎ···

কাশারিপাড়া রোডে জমিদার ও জুয়েলার শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের বাস। চৌধুরী মহাশয় ছ'মাস পরে কাল রাত্রি দশটায় বাড়ীতে ফিরিয়াছেন। আসিয়া আহারাদি করিয়া তিন-তলায় তার শয়ন-কক্ষে ঘুমাইতে যান। সকালে তার চাকর ঘরে গিয়া দেখে, চৌধুরী মশায় নাই! সারা বাড়ীতে কোথাও তিনি নাই। বিছানায় লাল রঙের একটা কাগজ আলপিনে আঁটা। কাগজে লেখা ইংরেজী অক্ষর T. সন্ধ্যার পর এই বাড়ীর ছাদে আসিয়া কারা নীল আলো জ্বালিয়াছিল এবং চৌধুরী মহাশয়ের চাকর মনসাকে তারা এমনি কাগজ দিয়া গিয়াছিল। ঐ আলো জ্বালার একটু পরেই হিমাংশুবাবু নাকি ও-বাড়ীতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় নায়েব জগদীশ বাবুকে সতর্ক হইতে বলিয়াছিলেন। আরো বলিয়াছিলেন, তেমন কিছু ঘটিলে জগদীশবাবু যেন তখনি ফোনে হিমাংশুকে খবর দেন। এ-ব্যাপারে ভয় পাইয়া জগদীশবাবু প্রথমে ফোন্ করিয়াছিলেন ভবানীপুর থানায়; এবং ফোনে এ-খবর

পাইয়া থানার বড় ইন্‌সপেক্টর পঞ্চাননবাবু তাদের গৃহে আসিয়াছেন। তিনি আসিয়া জগদীশবাবুর মুখে সব কথা শুনিয়া হিমাংশুকে এখন টেলিফোন করিতেছেন।

হিমাংশু বলিলেন—আমি এখনি যাচ্ছি পঞ্চানন··· এ-ব্যাপারে আমার interest আছে···তোমরা চলে যেয়ো না কেউ।

এ-কথা বলিয়া হিমাংশু চাহিলেন গুণময়ের পানে, বলিলেন, —এসো গুণময়, এ-কাজে আমার সঙ্গে আজ থেকে থাকবে। কিন্তু যাবার আগে এ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনার রায়-সাহেবকে একটু খপর দিয়ে যাই।

ফোনে হিমাংশু ডাকিলেন পুলিশের এ্যাসিস্টাণ্ট-কমিশনার রায়-সাহেবকে। রায়-সাহেব ফোন্ ধরিলেন। হিমাংশু তাকে এদিককার বৃত্তান্ত আমল বলিয়া বলিলেন।

শুনিয়া রায়-সাহেব বলিলেন—ও-আলো আমিও কাল দেখেছি হিমাংশু সন্ধ্যার সময়···ভবানীপুরের দিকে। আমি তখন গঙ্গার ধারে একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম, কোনো বিয়ে-বাড়ীর illumination বুঝি। আচ্ছা, তোমরা এগোও···আমিও এখনি যাচ্ছি। ঠিকানাটা?

হিমাংশু তাকে ঠিকানা ও পথের নির্দ্দেশ দিলেন। রায়-সাহেব বলিলেন—আধ-ঘণ্টার মধ্যে আমি গিয়ে পৌঁছবো।

রিসিভার রাখিয়া হিমাংশু গেলেন গেরাজে। তার টু-সীটার মোটর বাহির করিলেন এবং গুণময়কে লইয়া তখনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

সেখানে সেই জগদীশবাবু···ভৃত্য মনসাচরণ···মুখে কাহারো

কথা নাই! যেন মস্ত ঝড় বহিয়া গিয়াছে, সে-ঝড়ে সকলের মনে এমনি বিপর্যায় বিশৃঙ্খলা যে সকলে স্তম্ভিত।

পঞ্চানন বলিল—আমি এঁদের এজাহার নিয়েছি, দেখবেন?

হিমাংশু বলিলেন—না। ওঁদের মুখ থেকে আমি সব কথা শুনতে চাই।

এই কথা বলিয়া তিনি চাহিলেন জগদীশবাবুর পানে, বলিলেন—আমি তো কাল রাতে সেই চলে গেলুম। তারপর চৌধুরী মশায় হঠাৎ এলেন কখন? এলেন যদি তো সকালের আলো ফুটতে না ফুটতেই তিনি নিরুদ্দেশ! এ যেন আরব্য-উপন্যাসের গল্প!

ঈষৎ আর্ত স্বরে জগদীশবাবু বলিলেন—তাই বটে, মশায়!

হিমাংশু বলিলেন—আপনি বলুন দিকিনি সব ব্যাপার, নিজে যা জানেন।

জগদীশবাবু বলিলেন—আপনি তো সেই চলে গেলেন! তারপর আমরা খাওয়া-দাওয়া শেষ করেছি, এমন সময় এক-খানা ট্যাক্সি এসে থামলো। দেখি, ট্যাক্সি থেকে নামলেন, বাবু! বাবু একা...তাঁর মুখ খুব শুকনো। আমরা অবাক! বাবু বললেন—কিছু খাবার ব্যবস্থা করো জগদীশ...আর খুব শীগগির গরম জলের ব্যবস্থা করো, আমি চান করতে চাই!...তখনি স্নানের ব্যবস্থা হলো...খাবার-দাবারও তৈরী হলো। খাওয়া-দাওয়া করে বাবু শুতে গেলেন ওঁর তেতলার ঘরে। ঐ ঘরেই তিনি বরাবর শোন্। আমাকে বললেন, তুমি ওপরে আমার পাশের ঘরে শোবে চলো, মনসা শোবে আমার ঘরের কোলে যে-বারান্দা, সেই বারান্দায়। সেই ব্যবস্থাই পাকা হলো। ওঁর ঘর...আর আমি যে-ঘরে শুয়েছিলুম, এ-দু'ঘরের

মাঝখানে বড দরজা···সে দরজা খোলা রইলো। খোলা রাখার মানে, ইদানীং ব্লাডপ্রেসার রোগের দরুণ বাবুর হঠাৎ কখনো-কখনো বুক ধড়ফড় করতো···সেজন্য বাবু একা শুতেন না।··· সকালে উঠে আমি নীচে এসেছি···ভোরেই আমি উঠি··· চিরকালের অভ্যাস। নীচে এসে মুখ ধুচ্ছি···মনসা এলো ছুটে, এসে বললে, বাবু কোথায়? বাবুকে দেখতে পাচ্ছি না। আমি বললুম—সে কি! এখনো সদরের ফটক খোলা হয়নি! ফটকে তখনো তালা লাগানো···দরোয়ান-ব্যাটার কাজ নেই, বেলা সাতটা পর্য্যন্ত পড়ে ঘুমোয়। ধমক দিয়ে তাকে রোজ ফটকের চাবি খোলাতে হয়।

এ-কথার পর জগদীশবাব থামিলেন দম্ লইবার জন্য।

হিমাংশু বলিলেন—তারপর?

জগদীশবাবু বলিলেন—মনসাকে জিজ্ঞাসা করলুম, মনসা বললে—বাবু বলেছিলেন, মনসার ঘুম ভাঙ্গলে বাবুকে যেন সে জাগিয়ে তোলে। বেলা নটার ট্রেণে তিনি দেশে যাবেন। মনসার ঘুম ভাঙ্গতেই সে বাবুর ঘরে গিয়েছিল। গিয়ে দেখে, বাবু বিছানায় নেই। মনসা ভাবলে, দেশে গেলেন না কি? কিন্তু দেশে যে যাবেন···গেঞ্জি গায়ে, চটিজুতো পায়ে যেতে পারেন না! মনসার মুখে এ-কথা শুনে আমি যেন আকাশ থেকে পড়লুম। তখনি তিন-তলায় ছুটলুম। আমার সঙ্গে চললো গোমস্তা ন'কড়ি। উপরে এসে দেখি, খড়খড়ি বন্ধ। সারা বাড়ী ঘুরে খোঁজ করলুম, কোথাও তার চিহ্ন নেই!

সুগভীর মনোযোগে হিমাংশু এ-কথা শুনিলেন, বলিলেন—ঘরে সেই লাল কাগজ দেখেছিলেন? মনসাকে যে-কাগজে পাশ্ দিয়ে গিয়েছিল, ঠিক সেই রকম?

কিছু স্থির করতে পারিনি। এদের দলের সবিশেষ পরিচয়ের জন্য লালবাজার থেকে আজ আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করবো বোম্বাইয়ের পুলিশ-কমিশনারের কাছে।

পঞ্চাননের মন এ-কথায় যেন শূন্যে দুলিতে লাগিল !

গুণময় বলিল—নীল আলো দেখেছিলেন পঞ্চাননবাবু··· কাল রাত্রে ?

পঞ্চানন বলিল—দেখেছি বটে সন্ধ্যার পরে। কিন্তু সে আলোর সঙ্গে এ ব্যাপারের কোন সম্পর্ক আছে না কি ?

গুণময় বলিল—সেই নীল আলোই হলো এ-সহরে ওদের উৎপাতের সঙ্কেত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এবার বুঝি

তেতলায় আসিয়া হিমাংশু ঘর-দ্বার রীতিমত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। বড ঘর। একদিকে বড় খাট, খাটে বিছানা পাতা, মশারি ফেলা। অন্য দিকে বড় আয়না-ওয়ালা আলমারি। দুধারে দেওযাল ঘেঁসিয়া দুখানা কৌচ, তার পাশে পাথরের টেবিল, টেবিলের উপর একরাশ বই-খাতা। একদিকে আল্‌না, আল্‌নায় জামা-কাপড়। এ-ঘরের একদিকে বাথ-রুম, আর-একদিকে ছোট একটা ঘর। ছোট ঘরটির দ্বারে তালা আঁটা।

হিমাংশু সে-ঘর খুলাইলেন। মনসার কাছে চাবি ছিল। ঘরের মধ্যে কটা স্যুটকেশ, ময়লা কাপড-চোপড় রাখিবার জন্য একটা বেতের তৈরী রোব্ ছিল। হিমাংশু প্রত্যেকটি খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। কোথাও এমন চিহ্ন দেখিলেন না, যার উপর নির্ভর করিয়া কোনো নিশানা পান্। বাথ-রুমে আসিলেন। বাথ-রুমে কাদা-ধুলা···জলে সে কাদা-ধুলা জমিয়া পুরু হইয়া আছে। এবং সে কাদার উপর বড বড় জুতার দাগ। নাগরা জুতার দাগ বলিয়া মনে হয়।

হিমাংশু বলিলেন—এই ঘরে চোধুরী মশায় রাতে স্নান করেছিলেন?

মনসা বলিল—আজ্ঞে হাঁ। গরম-জলের ঐ যন্তর রয়েছে... আমি দেশলাই জেলে গ্যাশ জেলে দিয়ে গেছি...গ্যাশে জল গরম হয়।

হিমাংশু বলিলেন—এত কাদা এলো কি করে, বলতে পারো?

মনসা বলিল—না বাবু। বাবুর স্নান হয়ে গেলে আমি একবার এসে বাবুর জামা কাপড় বার করে নিয়ে গিয়েছিলুম, সেগুলো কেচে ঐ বারান্দায় তারে শুকোতে দিয়েছি। বাথ-রুমে আমি আর ঢুকিনি। এই এখন এলুম।

—কাদা দেখছো? যে কাদায় জুতোর দাগ?

—হ্যাঁ। এ কাদা চিনি না। কাদা আসবে কোথা থেকে যে থাকবে? বাথ-রুমের ওদিকে ঐ যে দরজা...ও দরজা বরাবর বন্ধ থাকে। জমাদার বাথ-রুম ধোবার জন্য এলে, তখন আমি ও দরজা খুলে দি।

হিমাংশু বলিলেন—একবার দরজা খোলো তো বাপু।

দরজা খোলা হইল। দরজা দিয়া লোহার ঘোরানো সিঁড়ি নামিয়া গিয়াছে একেবারে সেই নীচের তলায়।

হিমাংশু দেখিলেন, কাদামাখা জুতার দাগ এই দ্বার দিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়াছে। বলিলেন—দেখ্‌ছো, টাট্‌কা দাগ! এই পথ দিয়েই সব নীচে গেছে।

পঞ্চানন বলিল—কিন্তু অনেকগুলো পায়ের দাগ। সব এক-মাপের জুতো নয়।

গুণময় বলিলেন—না! তার উপর সবচেয়ে মজা এই যে এই দরজা দিয়ে নেমেছে...অথচ দরজা ভিতর থেকে বন্ধ।

হিমাংশু বলিলেন—একজন এদিকে ছিল। সকলে নেমে

হিমাংশু কোনো কথা না বলিয়া সুটকেশ খুলিলেন। জামা-কাপড় ভাঁজ-করা গুছানো…কাগজ-পত্র, ব্যাঙ্কের পাশ-বই, চেক-বই, এক-তাড়া চিঠি…চিরুণী, ব্রাশ, আয়না, সাবান, সেণ্ট…টুকিটাকি আরো অনেক জিনিষ…

হিমাংশুবাবু চিঠির তাড়া খুলিলেন। সব চিঠি চৌধুরী-মশায়ের নামে। কোনো চিঠি আসিয়াছে ব্যাঙ্ক হইতে; কোনো চিঠি বাড়ী হইতে; কোনো চিঠি…

একখানা চিঠি…পোস্টকার্ড…পড়িয়া তিনি যেন কূল পাইলেন! চিঠিতে লেখা আছে—

প্রিয় প্রমথ

আর পাঁচ-সাতদিন পরে আমি কলিকাতায় রওনা হইব। তুমিও একবার কলিকাতায় চলো। সেখানে গিয়া পরামর্শ হইবে। ইতি

সাত্যকি

হিমাংশুর মাথায় যেন রক্তস্রোত বহিল। তাঁর অনুমান তবে ঠিক। ঐ জুয়েলারির ব্যাপারে সাত্যকির সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর সংযোগ আছে। নহিলে দুজনে এক-সময়ে কলিকাতায় আসিবে কেন? আর আসিবামাত্র কলিকাতা সহরে নীল আলোর লহর ফুটিবে কেন?

চিঠিখানা সাত্যকি লিখিয়াছে প্রমথ চৌধুরীকে—টুঙ্গা হিল্স্, রাইপুর পোস্ট অফিস, সি-পি।

সেই সেণ্ট্রাল-প্রভিনসেস!…

সন্ধান করিতে করিতে লোহার সেই ঘোরা সিঁড়ির নীচে দেখিলেন, বাসের তিনখানা টিকিট পড়িয়া আছে…আট পয়সার টিকিট! টিকিট তিনখানা তিনি কুড়াইয়া লইলেন…

নীল আলো

একজন কনস্টেবল্ আসিয়া সেলাম করিল, কহিল—সাব্··· বড়া সাব্···

সকলে বুঝিলেন, এ্যাসিস্ট্যান্ট-কমিশনার রায় সাহেব আসিয়াছেন।

পঞ্চানন বলিল—আমি তাকে এখানে নিয়ে আসি।

হিমাংশু বলিলেন—সেই ভালো পঞ্চানন, তুমি যাও। আমি ততক্ষণ এদিকে ওই জুতোর দাগের সন্ধান নিই। তাছাড়া মনে যে-সব কথা জাগছে···অন্যদিকে এখন মন দিতে চাই না···

রায় সাহেব আসিয়া সংবাদ লইলেন। দু'চারিটা আলোচনা হইল। তারপর তিনি চলিয়া গেলেন··

তিনি চলিয়া যাইবার পর এ-বাড়ীর চারিদিকে যত সন্ধান শেষ করিয়া হিমাংশু পকেট-বুকে অনেক কথা নোট করিলেন। তারপর তিনি যখন বিদায় লইলেন, বেলা তখন এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে।

পনেরো মিনিটে স্নানাহার করিয়া হিমাংশু আসিলেন লালবাজার পুলিশ অফিসে। আসিয়া রায় সাহেবের সঙ্গে খানিকটা আলোচনা করিয়া রায়-সাহেবের সঙ্গে গিয়া ঢুকিলেন পুলিশ-কমিশনারের কামরায়। বহুক্ষণ ধরিয়া তিনজনে পরামর্শ হইল। পরামর্শান্তে টেলিফোন করিলেন বোম্বাইয়ের পুলিশ-কমিশনার সাহেবকে। ট্রাঙ্ক-কল্। আধ ঘণ্টা পরে লাইন মিলিল। ওদিক হইতে সাড়া আসিল—ইয়েস্?

এদিক হইতে উত্তর গেল—লালবাজার পুলিশ অফিস··· ডেপুটি-কমিশনার অফ্ পুলিশ, ডি. ডি. ক্যালকাটা···

ওদিক হইতে প্রশ্ন—ইয়েস ?

এদিক হইতে উত্তর—টোপির দল এখানে আসিয়া উৎপাত সুরু করিয়াছে। দলের কাহারো নাম জানা নাই। তারা কি জাত...কি নাম ..সংবাদ পাইলে তদারকীর সুবিধা হইবে।

ওদিক হইতে উত্তর আসিল পনেরো মিনিট পরে—উহাদের দু'টা দল আছে,—একটা বোম্বাইয়ে, আর একটা নাগপুরে। বোম্বাইয়া-দলে আছে নাথারাম; ভেঙ্কট; আপ্পাজী; আর পীর হুশেন। নাগপুরের দলে আছে কাম্পুর; তান্তিয়া; কাশীনাথ। আরো খবর মিলিল, এরা নানা ভাষা জানে।

প্রশ্ন হইল—চেহারা ?

উত্তর আসিল চেহারার বর্ণনা। সে বর্ণনায় একটা ঝুলো-গোঁফ পাওয়া গেল। হ্যারিসন রোডের বাড়ীতে ঝুলো-গোঁফওয়ালা লোকের কথা শুনা গিয়াছিল। সে-গোঁফের মালিক নাথারাম। এ দলটি বহুরূপী সাজিতে ওস্তাদ। দলের নায়ক ঐ কাশীনাথ। তার গায়ে যেমন জোর, মাথায় তেমনি বুদ্ধি খেলে। দলের লোক তার নাম দিয়াছে 'বৃকোদর'। একবার সে নাকি...*

কিন্তু সে কথা এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই।

আরো খবর মিলিল, এ দলের অধীনে আছে বহু লোক। তবে ঐ ক'জনই রুই-কাৎলা। বাকীরা ইহাদের পাশে চুনো-পুঁটি। তবু শয়তানীতে কেহ কম নয়।

সংবাদ শুনিয়া হিমাংশু দাগী-আসামীদের রেজিষ্ট্রি-কেতাব বাহির করিলেন। সে খাতায় বিশ বছরের নাম ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে

* কাশীনাথের কথা এ সিরিজের "মরণ যজ্ঞ" উপন্যাসে শীঘ্র বাহির হইবে।

নাম বাহির হইল, কাশীনাথ দাস…কীর্তি—সিঁধ কাটিয়া চুরি…১৯৩০ সালে এক বছরের জন্য জেল হইয়াছিল। তারপর আরো ছ'বার ঐ সিঁধ কাঠ চালানোর ফলে জেল। সে ছ'বারে পাঁচ ছটা নূতন নাম লইয়াছিল—এ-সব নামের সঙ্গে আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই। ক'বারই খাতায় তার ঠিকানা লেখা—কালীঘাট, মহিম হালদার ষ্ট্রীট।

এ-সব দেখিয়া শুনিয়া রায়-সাহেবকে হিমাংশু বলিলেন—আমি স্যর, এবারে একটু বেরুচ্ছি। বাসের যে তিনখানা টিকিট পেয়েছি, তার সন্ধান নেবো। তারপর একবার দেখবো ঐ মহিম হালদার ষ্ট্রীটে কোনো খপর পাই কিনা।…

রায়-সাহেব বলিলেন—রিভলভার রেখো সঙ্গে…কখন কোনদিকে যাবে, তার তো ঠিক নেই। মনে আছে, টমাসের হোটেলের সেই খুনের তদারকাতে ডেপুটি সাহেব অস্ত্রে তোমায় কি-রকম সজ্জিত করেছিলেন*!

হাসিয়া হিমাংশু বলিলেন—সেই থেকে আমি সব সময়ে রিভলভার সঙ্গে রাখি।

এ-কথা বলিয়া হিমাংশু লালবাজার হইতে বাহির হইলেন।

প্রথমে আসিলেন বাস-সিণ্ডিকেটের অফিসে। সেখানে পরিচয় দিয়া বলিলেন—এ তিনখানা টিকিট সম্বন্ধে আমি খপর চাই এখনি। জরুরি কাজ। কোন্ লাইনের কত নম্বরের বাসে এ-টিকিট বিক্রী হয়েছে? আর কবে?

টিকিট দেখিয়া সিণ্ডিকেটের লোকজন ওয়ে-বিল ও খাতাপত্র ঘাঁটিয়া বলিল—এখনি তো খপর মিলবে না স্যর। প্রথমে দেখতে হবে…মানে, আট পয়সার টিকিট…চিৎপুর,

* কাঞ্চনজঙ্ঘা-সিরিজের 'জীবন্ত-সমাধি'তে এ কথা আছে।

শ্যামবাজার, শেয়ালদা, কালীঘাট, বালিগঞ্জ—সব লাইনেই দু' আনার টিকিট ইশু হয়। কাজেই একটু সময় লাগবে।

হিমাংশু বলিলেন—কেন সময লাগবে? আপনারা প্রত্যেক ডিপোয় ফোন করুন…

কর্মচারী বলিল—ডিপোতে ফোন নেই।

হিমাংশু বলিলেন—কিন্তু কাল সকালে এ-সম্বন্ধে খপর দেওয়া চাই। বেলা ঠিক এগারোটায়…লালবাজার পুলিশ-অফিস …ডিটেক্টিভ ডিপার্টমেণ্ট। আমি বরং চিঠি লিখে আপনাকে এ-সম্বন্ধে পুলিশের direction জানাই…

এ-কথা বলিযা পকেট হইতে একখানা পুলিশ-মেমো কাগজ বাহির করিযা তাহাতে সিণ্ডিকেটের নামে তিনখানা টিকিটের নম্বর লিখিয়া নির্দ্দেশ দিলেন—খপর চাই চবিবশ ঘণ্টার মধ্যে।

কর্ম্মচারীর হাতে চিঠি দিযা তিনি সেখান হইতে বাহির হইলেন। বাহির হইয়া সামনে যে-বাস পাইলেন, সেই বাসে উঠিয়া কালীঘাটে চলিলেন। এবার মহিম হালদার ষ্ট্রীট।

বাসখানা ছিল 4A নম্বরের…অর্থাৎ চিৎপুর লাইনের বাস। কণ্ডাকটর বাঙালী। কণ্ডাকটরকে তিনি প্রশ্ন করিলেন —এ কোন লাইনের টিকিট, বলতে পারো, বাপু?

তিনি কণ্ডাকটরকে একখানা টিকিট দেখাইলেন। পেঁয়াজী রঙের কাগজে আট পয়সা হরফ ছাপা টিকিট। মাথায় নম্বর ছাপা আছে…আর সে-টিকিটের পিছনে বাঙালা হরফে লেখা আছে—'জগদ্ধাত্রী'। টিকিট দেখিয়া কণ্ডাকটর বলিল— ও…এ স্যর, নর্দার্ন ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির বাস। 'জগদ্ধাত্রী' বলে একটা বাঙলা টকি-ছবি বেরিয়েছিল প্রায় ছ'মাস আগে।

তাদের বিজ্ঞাপন প্রচার হবে বলে তারা এ-কাগজ ছেপে ওই কোম্পানিকে দিয়েছিল টিকিট করবার জন্য ·

হিমাংশুর মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—এদের অফিস কোথায়, জানো?

কণ্ডাকটর বলিল—বাগবাজার স্ট্রীটে। এ কোম্পানির মালিকের নাম হলো অম্বুজ মল্লিক। তার তিনখানা বাস আছে—তিনখানাই ঐ চিৎপুর-লাইনে চলে।

হিমাংশু শুধু বলিলেন—বটে! বলিয়া তিনি পয়সা দিয়া টিকিট কিনিলেন।

তারপর বাস আসিয়া মনোহরপুকুরের মোড়ে থামিলে নামিয়া হিমাংশু ঢুকিলেন ডাহিনে মহিম হালদার স্ট্রীটে। বাড়ীর নম্বর মনে ছিল। খুঁজিয়া সে নম্বর বাহির করিলেন। দেখিলেন, বস্তী। বস্তীতে সাত আট ঘর গরীবের বাস।

সন্ধান করিলেন—এ বস্তীতে কাশীনাথ থাকে?

সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিল। হিমাংশু বলিলেন—দাগী বদমায়েস—সারা কলকাতায় নাম আছে নাগপুরে মাঝে মাঝে যায় জানো?

একজন বৃদ্ধ মোড়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল। সে বলিল—ও, মনে পড়েছে বংশী দাসের ছেলে। বংশী কামারের কাজ করতো। তার ছেলে ঐ কাশীনাথ। বাপ ইস্কুলে দিয়েছিল। দু'চার বছর পড়েছিল ইস্কুলে। পড়াশুনায় মন ছিল না। তারপর বাপ গেল মরে। তখন দোকান করে বসলো। সে দোকান মন্দ চলছিল না··তারপর কি তার মতিচ্ছন্ন হলো, বদ সঙ্গে পড়ে শেষে সিঁধ-কাঠি ধরতে শিখলো। একবার জেল হলো। তারপরে···

হিমাংশু বলিলেন—হ্যাঁ···সেই লোককেই চাই! কোথায় আছে, জানো?

বৃদ্ধ বলিল—না বাবু···জেল থেকে বেরিয়ে সে আর এ-মুখো হয়নি। প্রায় দশ-এগারো বছর হয়ে গেছে, নিরুদ্দেশ। তার মা ছিল বেঁচে···কোন্ বাবুদের বাড়ীতে বাসন-মাজার কাজ করতো। তা সে-মাও মরে গেছে!

হিমাংশু বলিলেন—এখানে আসে না? তার পুরোনো বন্ধু-বান্ধব কেউ নেই?

বৃদ্ধ বলিল—বন্ধু! আচ্ছা দেখছি···ওরে হাবলা···

এ-আহ্বানে পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর বয়সের একজন জোয়ান লোক আসিয়া দেখা দিল। সে বলিল—কেন?

বৃদ্ধ বলিল—মনোহরপুকুরে থাকে নেপা···ওর সঙ্গে খুব ভাব ছিল না কাশীর? কাশীর কথা নেপা বলতে পারবে না?

হাবলা বলিল—তা আমি কি করে বলবো?

বৃদ্ধ কহিল—আচ্ছা, পারেন যদি বাবু, আপনি যান মনোহরপুকুর লেনে। রোড নয়, লেন। লেনে ঢুকতেই বাঁ-দিকে দেখবেন একটা টিন-মিস্ত্রীর দোকান। সে-দোকান হলো ঐ নেপার। তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন দিকিনি সে যদি সন্ধান দিতে পারে।

এ-কথা শুনিয়া হিমাংশু আর এক-মিনিট দাঁড়াইলেন না। ফিরিয়া একখানা রিক্শ ডাকিয়া সেই রিক্শয় চাপিয়া তিনি চলিলেন মনোহরপুকুর লেনের দিকে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিজ্ঞাপনের ফল

মনোহরপুকুর রোডে নেপার দেখা মিলিল। কিন্তু সেখানে কাশীনাথের সন্ধান মিলিল না। নেপা কহিল—না বাবু, শুনতে পাই, সে নাকি জেলে গিয়েছিল, তারপর বদমায়েসী করে বেড়ায়...আমি গরীব মিস্ত্রী-মানুষ তার খবর কেনই বা রাখবো! শেষে কি বিপদ ডেকে আনবে!

হিমাংশু বিলম্ব না করিয়া সেখান হইতে ফিরিলেন লাল-বাজারে। ট্রামে বসিয়া এ রহস্য আবিষ্কারের নানা উপায় চিন্তা করিলেন। একটা উপায় মনে লাগিল।

আসিয়া ডেপুটি-সাহেবের কাছে সে উপায়ের কথা বলিলেন। ডেপুটি-সাহেব বলিলেন—চমৎকার মতলব, হিমাংশু! ইয়েস, ডু ইট্ য্যাট্ ওয়ান্স!

হিমাংশু তখন কাগজে-কাগজে বিজ্ঞাপন লিখিয়া পাঠাইলেন। কলিকাতার সব কাগজে সে-বিজ্ঞাপন ছাপা হইল। কাগজের যে পৃষ্ঠায় স্থানীয় সংবাদ ছাপানো হয়, সেই পৃষ্ঠায়...বড় বড় হরফে। ইংরেজী-বাঙলা দু' ভাষাতেই বিজ্ঞাপন পাঠানো হইল। এবং পরের দিনের সমস্ত দৈনিক সংবাদ-পত্রে এই বিজ্ঞাপন বাহির হইল—

সহরবাসী সাবধান!

কলিকাতায় সম্প্রতি [illegible]।
এ দলের নাম "নীল আলো।" যে বাড়ীর উপর বা যে বাড়ীর

নীল আলো

লোকজনের উপর ইহাদের লক্ষ্য সেই বাড়ীর ছাদে কিম্বা সে-বাড়ীর কাছাকাছি অন্য কোনো বাড়ীর ছাদে উঠিয়া ইহারা নীল আলো জ্বালায়। বলে, সিনেমার ছবি তুলিবে। এই কথা বলিয়া বাড়ীর মালিক বা সে বাড়ীতে যে থাকে, তার অনুমতি লইয়া ছাদে গিয়া ওঠে। আসলে ছবি তোলে না। আলো জ্বালিয়া দলের অন্য লোকজনকে সঙ্কেত জানায় এবং ছবি তোলার ছলে বাড়ীর সব সন্ধান জানিয়া লয়। কেহ এমন ছবি তুলিতে চাহিলে, খবরদার, তাহাকে বা তাহাদের সে-অনুমতি দিবেন না। অনুমতি দিলে বিপদে পড়িবেন। এ দলের কাহারো সন্ধান যিনি লালবাজার পুলিশ অফিসে দিতে পারিবেন, কিম্বা তাহাদের গ্রেফতার সম্বন্ধে সাহায্য করিতে পারিবেন, তাহাকে পাঁচ-শত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। এ দলের একজনের নাম কাশীনাথ ওরফে বৃকোদর, এবং তান্তিয়া। তান্তিয়ার কানে-ঝুলো বড় বড় গোফ আছে।

কমিশনার সাহেবের অনুমত্যনুসারে
(স্বাক্ষর) শ্রীহিমাংশু চৌধুরী
ইন্‌স্পেক্টর অব পুলিশ, ডি-ডি লালবাজার, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন পাঠাইয়া হিমাংশু গেলেন বাগবাজারে অম্বুজ মল্লিকের কাছে। গিয়া সন্ধান লইয়া জানিলেন, সে টিকিট চিৎপুর লাইনের গাড়ীতে বিক্রয় হইয়াছিল। ঐ তিনটা নম্বরের টিকিট রাত্রি আটটায় যে-বাস চিৎপুর ছাড়িয়াছিল, সেই বাসে বিক্রয় হইয়াছে। যে-প্যাসেঞ্জারদের এ-টিকিট বেচিয়াছে, কণ্ডাক্টর বহু চেষ্টা করিয়াও তাদের চেহারা স্মরণ করিতে পারিল না।

টিকিটের বৃত্তান্ত হইতে হিমাংশু বুঝিলেন, প্রমথবাবু বাড়ী আসিতেছেন, এ সংবাদ ইহারা পূর্বে পাইয়াছিল;

এবং সে সংবাদ পাইয়া ভবানীপুর কাঁশারিপাড়ায় প্রমথবাবুর বাড়ীর কাছে কোথাও আসিয়া আত্মগোপন করিয়া ছিল, তারপর সময় বুঝিয়া কাজ সারিয়া চম্পট দিয়াছে! আরো মনে হইল, আসিয়াছে বাগবাজারের দিক হইতে। কণ্ডাকটরের টিকিট-ওয়ে-বিল দেখিয়া বুঝা যায়, সে-ট্রিপে তার কাছে আট পয়সার টিকিট সুরু হইয়াছিল বী (B) ৩১৭৫ নম্বর হইতে। এ তিনটি টিকিটের নম্বর ৩১৭৯, ৩১৮০, ৩১৮১। সে ট্রিপে আট পয়সার টিকিট বিক্রয় হইয়াছে ৩১৮৭ নম্বর পর্য্যন্ত। অর্থাৎ আট পয়সার টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল মোট তেরোখানি। বাগবাজারের মোড় হইতে হ্যারিসন রোড—যে-সব যাত্রী এ জায়গা হইতে বাসে ওঠে কালীঘাট-লাইনে যাইবে বলিয়া, তারাই একখানি করিয়া টিকিট কিনিয়াছে। হ্যারিসন রোডের দক্ষিণ-দিক হইতে কালীঘাটের টিকিটের দাম সাত পয়সা করিয়া। সুতরাং এ তিনজন লোক বাসে উঠিয়াছে বাগবাজারের মোড় হইতে হ্যারিসন রোড এলাকার মধ্যে। তবে বাগবাজারের মোড়ে উঠিলে টিকিটের নম্বর আরো কম হইত। বীডন্ ষ্ট্রীট এবং নিমতলা ষ্ট্রীটের মোড়ে ওঠে নাই তো? নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটের একটা বাড়ীতে সে-দিন সন্ধ্যার পর নীল আলো জ্বলিয়াছিল··· সে-বাড়ীতে না হোক, সে-বাড়ীর কাছাকাছি এরা আস্তানা লয় নাই তো?

লইলেও সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। যদি miracle কিছু ঘটে, তবেই সন্ধান মিলিতে পারে। নচেৎ নয়!

পরমেশ্বরীর * কথা মনে জাগিল। তাকে বলিলে সে

* এই পরমেশ্বরীর কথা যদি আরো বিশেষভাবে জানিতে চাও, তাহা হইলে "কাঞ্চনজঙ্ঘা-সিরিজের" "জীবন্ত-সমাধি" উপন্যাস পড়ো।

কোনো কিনারা করিতে পারে না? হিমাংশু ডাকিলেন গুণময়কে। বলিলেন—আর্দালী-সেপাইয়ের কাজ নয় গুণময়, তুমি একবার এখনি যেতে পারো পরমেশ্বরীর সন্ধানে? তাকে বলবে, এখনি…মানে, as early as possible আমার সঙ্গে এখানে এসে দেখা করবে। যাও ভাই…

গুণময় বলিল—আমি কোয়ার্টার্লি-রিপোর্ট দেখে ইনডেক্স তৈরী করছি। রায়-সাহেব বলেছেন…

হিমাংশু বলিলেন—কোনো দোষ হবে না। রায়-সাহেবকে আমি গিয়ে এখনি বলছি, গুণময়কে একটু জরুরি কাজে পাঠিয়েছি। আমার মোটর বাইরে আছে, তাইতে চড়ে তুমি একবার যাও……পরমেশ্বরী থাকে ছাতাওয়ালা গলিতে। জানো তো?

গুণময় বলিল—তার বাড়ী আমি চিনি, স্যর।

—ও, অল্ রাইট্…

গুণময় তখনি বাহির হইয়া গেল। হিমাংশু ডায়েরি লিখিতে বসিলেন।

বেলা প্রায় তিনটার সময় গুণময় ফিরিল। বলিল—পরমেশ্বরীকে পেয়েছি, স্যর। সে গিয়েছিল বেলেঘাটায় তার এক ভাইপোর অসুখ, সেই ভাইপোকে দেখতে। সেখানে গিয়ে তাকে ধরেছি।

হিমাংশু বলিলেন—পরমেশ্বরী এসেছে?

গুণময় বলিল—সাড়ে-তিনটের মধ্যে আসবে। ভাইপোর জন্য একটা ওষুধ কিনে দিয়েই আসবে, বলেছে।

হিমাংশু বলিলেন—তাকে তুমি কিছু বলেছো?

…মা। আমি শুধু আপনার নাম করে বলেছি, তোমাকে তিনি ডাকছেন…এখনি আসতে হবে…খুব জরুরি কাজ। সে বললে, সাড়ে-তিনটের মধ্যে আমি ঠিক গিয়ে পৌঁছুবো, বাবু…

হিমাংশু বলিলেন—সে ঠিক আসবে। সাহেবদের মতো সে পাংচুয়াল।

হিমাংশু আবার ডায়েরি-লেখায় মনোনিবেশ করিলেন।

দু'চার পাতা লিখিয়াছেন, ফণী আসিয়া বলিল—একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বোধ হয়, ঐ নীল আলোর ব্যাপারে।

হিমাংশুর মাথায় রক্ত ছলাং করিয়া উঠিল…সত্য? তিনি বলিলেন—কি করে জানলে?

ফণী বলিল—তাঁর হাতে একখানা দৈনিক বসুমতী। বললেন,—কাগজের বিজ্ঞাপনে এই যে নাম হিমাংশু চৌধুরী, ইনি এখানে আছেন?…তাই থেকে মনে হচ্ছে…

হিমাংশু বলিলেন—চলো, বাইরে গিয়ে কথা কই। এ ভিড়ের মধ্যে নয়।

কথাটা বলিয়া ফণীর সঙ্গে হিমাংশু আসিলেন বাহিরের বারান্দায়। ফণী বলিল—ঐ সে ভদ্রলোক…

ফণীর নির্দ্দেশ লক্ষ্য করিয়া হিমাংশু দেখিলেন, বেচারী-গোছ দেখিতে পঞ্চাশ বৎসর বয়সের একজন বাঙালী বাবু… জীর্ণ মূর্ত্তি…

হিমাংশু বলিলেন—আপনি কি চান?

লোকটা বলিল—আজ্ঞে, এই বিজ্ঞাপন দেখে আমি এসেছি। আমাদের পাড়ায় নতুন একখানা চার-তলা বাড়ী তৈরী হচ্ছে… এখনো চুণ-বালির কাজ শেষ হয়নি…তবে ছাদ উঠেছে। আমি

বাড়ীর দালালী করি। সেই বাড়ীর দরোয়ান···তাকে আমি জিজ্ঞাসা করছিলুম, বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে কি না? দরোয়ান বললে, হ্যাঁ। আমি তখন বাড়ী দেখতে গেলুম। বেরিয়ে এসে দেখি, কালো-ঝুলো-গোঁফ একজন লোক দরোয়ানের সঙ্গে কথা কইছে··বলছে, সিনেমার ছবি তুলবে ঐ বাড়ীর ছাদ থেকে··আজ সন্ধ্যার পর। দরোয়ানকে সে একটা টাকা দিলে। দেখে সোজা আমি আপনার কাছে এসেছি।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটির আপাদ-মস্তক হিমাংশু লক্ষ্য করিলেন। বলিলেন—আপনার নাম?

—আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

—হুঁ।···বাড়ী?

—আজ্ঞে, আমি থাকি আহিরীটোলায় গণেশ হালদার লেনে ··৭ নম্বর বাড়ী।

হিমাংশু বলিলেন—যে-বাড়ীর ছাদে উঠে ওরা ছবি তুলবে, সে-বাড়ী কোথায়?

—আজ্ঞে, সে-বাড়ী হলো দর্জ্জীপাড়ায়···মন্দির লেনে। বাড়ীর নম্বর এখনো হয়নি।

—এখনি গেলে সে-বাড়ী দেখাতে পারবে?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—সে-দরোয়ানকে?

—আজ্ঞে, তা তো বলতে পারি না। তবে দরোয়ান ঐখানেই থাকে। কোথায় আর যাবে?

—কার বাড়ী ওটা?

দরোয়ান বললে—বাড়ীওয়ালার নাম মিহির ভটচায্যি।

তিনি থাকেন শিবু ঠাকুর লেনে। দরোয়ানকে আমি মালিকের নাম-ঠিকানা জিজ্ঞাসা করেছিলুম।

হিমাংশু সব কথা নোট-বুকে টুকিয়া লইলেন। তারপর বলিলেন—বেশ, তোমার কথা যদি সত্য হয়, এরা কেউ ধরা পড়ে, তুমি পাঁচশো টাকা রিওয়ার্ড পাবে।

শ্রীশ চক্রবর্ত্তী বলিল—আপনারা ওদের ধরবার ব্যবস্থা করবেন না? ওরা আসবে রাত আটটায়।

হিমাংশু ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, বলিলেন—কি করে জানলে?

শ্রীশ চক্রবর্ত্তী বলিল—আজ্ঞে, দরোয়ানকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম কি না, ওরা তস্‌বীর ওঠাবে কখন? তাতে দরোয়ান বললে, রাত আটটায় এসে তুলবে।

হিমাংশু বলিলেন—বেশ, তুমি সেখানে থেকো। সাড়ে-সাতটার পর আমাদের লোক যাবে।

শ্রীশ চক্রবর্ত্তী বলিল—আপনাদের লোককে আমি কি করে চিনবো? তিনিই বা আমাকে কি করে চিনবেন?

হিমাংশু দেখিলেন, লোকটার চাড় তাঁর চেয়েও বেশী। তিনি বলিলেন,—আমি সঙ্গে যাবো।

লোকটা যেন খুশী হইল! বলিল—আজ্ঞে, সেই হলেই ভালো হয়। তাহলে এ-কথা পাকা রইলো, আমি সেখানে হাজির থাকবো! কেমন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

লোকটা চলিয়া গেল।

হিমাংশু আসিয়া গুণময়কে ডাকিলেন। বলিলেন—ঐ লোকটার পিছু নাও। ও না জানতে পারে···বুঝলে গুণময়। ও কোথায় যায়, কি করে, ছাখো। তারপর দেখে এসে আমায়

[illegible]…ওকে আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে। ওদের [illegible] বুঝিবা!

—ওদের চর!

হিমাংশু বলিলেন—হওয়া বিচিত্র নয়। হলে খুব ভালো হয়। তুমি যাও…দেরী করো না। উপর থেকে আমি দেখিয়ে দি…কটক দিয়ে সে বেরবে এখনি। নীচে নেমে গেছে।

গুণময়কে লইয়া হিমাংশু বারান্দার পূব-দিককার খোলা খিলানের নীচে আসিয়া দাঁড়াইলেন…শ্রীশ চক্রবর্ত্তী ফটকের কাছে…তার অলক্ষ্যে হিমাংশু গুণময়কে দেখাইলেন। বলিলেন—ঐ লোক…যাও গুণময়।

গুণময় তখনি ছুটিল নীচে। হিমাংশু আসিয়া আবার নিজের আসনে বসিলেন।

সাড়ে-তিনটায় পরমেশ্বরী আসিল। হিমাংশু তাকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন।

শুনিয়া পরমেশ্বরী বলিল—সে রোশ্‌নি হামি দেখেছি বাবু। হামি ভেবেছিলুম, বুঝি আতস-বাজি পুড়াচ্ছে কেউ।

হিমাংশু বলিলেন—আতসবাজি নয় পরমেশ্বরী। খুব ওস্তাদ খেলোয়াড়ের দল! এরা বোম্বাইয়া দল…কলকাতা এদের ফন্দীবাজীর কাছে হার মানে! তুমি সন্ধান করো, তান্তিয়া আর ঐ কাশীনাথ…কাশীনাথের পোষাকী নাম হলো বৃকোদর। লোকটা ভোল্ বদলাতে পারে আশ্চর্য্য-রকম! থিয়েটার করলে মেক্-আপের রাজা বলে নাম কিনতো।

কুঞ্চিত ভ্রূ-যুগল…পরমেশ্বরী তার স্মৃতির-গহনে প্রবেশ করিয়া নিবিষ্টভাবে সেখানে সন্ধান করিতে লাগিল…কাশীনাথ

কাশীনাথ···গোষাকী নাম বৃকোদর···কে? কে? কে এমন খোয়াড় ?

স্মৃতির গহনে কাশীনাথ বলিয়া কাহাকেও পাইল না।

পরমেশ্বরী বলিল—না বাবু, মনে পড়ছে না।

হিমাংশু বলিলেন—সন্ধান করতে হবে। আর এক কাজ করো দিকিনি পরমেশ্বরী···দর্জ্জীপাড়ায় মন্দির লেন আছে··· সেই লেনে ৭ নম্বর বাড়ী···সে বাড়ীতে কে থাকে, এখনি ঘুরে এসে আমায় বলবে।

সকৌতুহলে পরমেশ্বরী চাহিল হিমাংশুর পানে। হিমাংশু হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন—মুখের পানে চেয়ে কি দেখছো? আমার মুখে কিছু লেখা আছে?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া পরমেশ্বরী বলিল—তা নয়। আমার মুস্কিল হয়েছে বাবু···ভাইপোর খুব অসুখ। ভাই মারা গেছে··· ভাইপো একা···বাড়াবাড়ি অসুখ চলেছে।

হিমাংশু বলিলেন—হাসপাতালে দিতে চাও?

—চেষ্টা করেছিনুম বাবু। কিন্তু জানাশুনা মুরুব্বি না থাকলে হাসপাতালে এখন রোগী দেবার উপায় হয় না, বাবু।

হিমাংশু বলিলেন—আমি যদি ব্যবস্থা করে দি? চিকিৎসা ভালো হবে। বাড়ীতে তুমি কি-চিকিৎসা করাবে?

—তা যদি হয় বাবু, নিশ্চিন্ত হয়ে আমি আপনার সঙ্গে থাকতে পারি তাহলে।

—আচ্ছা, দাঁড়াও।

হিমাংশু তখনি ফোন্ করিলেন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে অফিসে আছেন ক্ষেত্রবাবু···তাকে। ফোনে তাঁকে জানাইলেন, ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে, আজ···

এখনি। রোগীর কাকাকে জরুরি কাজে পুলিশের দরকার। রোগীকে হাসপাতালে না পাঠাইলে রোগী মারা যাইতে পারে, অথচ সরকারী কাজে তার কাকাকে চাই।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—সাহেবকে বলে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি··· রোগীর নাম?

পরমেশ্বরীকে প্রশ্ন করিয়া হিমাংশু বলিলেন—তার নাম লছ্‌মণ্‌।

—বেশ। এ্যাম্বুলান্স পাঠাতে হবে?

—তাহলে ভালো হয়। আমি আপনার কাছে চিঠি লিখে তার কাকাকে এখনি পাঠাচ্ছি ক্ষেত্রবাবু।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—আচ্ছা।

এ-কথা বলিয়া চিঠি লিখিয়া হিমাংশু তখনি পরমেশ্বরীকে পাঠাইলেন হাসপাতালে ক্ষেত্রবাবুর কাছে। বলিয়া দিলেন—ব্যবস্থা করে তুমি আহিরীটোলায় যাবে পরমেশ্বরী। সেখান থেকে সোজা আসবে লালবাজার। তোমার জন্য আমি বসে থাকবো। এই নাও, একটা টাকা আছে, রাখো···ট্রামের ভাড়া···

টাকা লইয়া পরমেশ্বরী তখনি ছুটিল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

নবম পরিচ্ছেদ

আবার সেই আলো

গুণময় ফিরিল, বেলা প্রায় সাড়ে-চারিটা…

গুণময় আসিয়া বলিল—লোকটাকে দেখলুম লালবাজারের মোড়ে ট্রামে উঠলো। আমিও সে-ট্রামে উঠে চেপে বসলুম। সে গিয়ে নামলো আহিরীটোলার মোড়ে…আমিও নামলুম। তারপর আহিরীটোলা ষ্ট্রীট ধরে খানিক গিয়ে ডান দিকে ছোট গলি—গণেশ হালদার লেন। সেই লেনের একটা বাড়ীতে সে ঢুকলো—বাড়ীর নম্বর ৭। দেখে আমি চলে আসছি।…

হিমাংশুর বুকখানা দশ হাত নামিয়া গেল। যা ভাবিয়াছিলেন, তা তবে নয়!

তিনি বলিলেন—আচ্ছা, যাও, তুমি কাজ করোগে…হ্যাঁ… সাড়ে-সাতটায় আমার সঙ্গে যেতে হবে এক-জায়গায়। চেহারাটা একটু বদলে ফেলো। পুলিশ্ বলে যেন চেনা না যায়! মুখে গোঁফ-দাঁড়ি থাকলে ভালো হয়, বুঝলে'

গুণময় বলিল—বেশ। সাড়ে-সাতটায় কোথায় গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করবো?

হিমাংশু বলিলেন—কলেজ ষ্ট্রীটের ওয়াই-এম-সি-এতে। আমি ঠিক তার সামনে থাকবো। স-সাতটা থেকে সাড়ে-সাতটা…বুঝলে?

…প্রবেশ।

…গুণময় কাজ করিতে গেল। অস্থির মন লইয়া হিমাংশু সুদীর্ঘ বারান্দায় পায়চারি করিতে লাগিলেন।

সাড়ে-পাঁচটার পর পরমেশ্বরী আসিল, বলিল, হাসপাতালে ভাইপোকে পৌঁছাইয়া সে গিয়াছিল আহিরীটোলায় ৭ নম্বর গণেশ হালদার লেনে। বাড়ীতে চার-ঘর ভাড়াটিয়ার বাস। তিনজন বাঙালী, একজন খোট্টা ফলওয়ালা। ফলওয়ালার নাম বুদ্ধু: বাঙালীদের নাম হরকান্তবাবু, মধুবাবু আর শ্রীশবাবু।

শ্রীশ। লোকটা তবে সত্য কথা বলিয়াছে। দেখা যাক, তার সে-কথায় নীল আলোর রহস্য আবিষ্কার হয় কি না। মোদ্দা খুব সতর্ক হইতে হইবে। যারা বুদ্ধিমান্ জীবন্ত ভদ্রলোকদের নিঃশব্দে গায়েব করিতে পারে, বিপদ বুঝিলে নর-হত্যা করা তাদের কাছে মশা-মাছি মারার সামিল।

সামনে অকূল পাথার…সে পাথারে কোথাও তীরের রেখা দেখা যায় না।…

বাড়ীতে স্নানাদি করিয়া সতর্ক-সাজে সজ্জিত হইয়া হিমাংশু আসিলেন কলেজ ষ্ট্রীটে ওয়াই-এম্-সি-এর সামনে।

সাতটা ষোল মিনিট। পথে বেশ ভিড়। আসিয়া ভিড়ের মধ্যে তিনি চারিদিকে তাকাইতেছেন…

একজন ভিখারী আসিয়া বলিল—একটা পয়সা দিবেন বাবু?

কণ্ঠস্বর চিনিলেন, ভিখারী নয়…ভিখারীর বেশে গুণময়।

ভিখারী-বেশী গুণময়কে আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিয়া হিমাংশু

পার্শ্ব বাহির করিলেন, করিয়া বলিলেন—এই গলির মধ্যে আয় ...পয়সা দেবো।

গুণময়কে লইয়া তিনি ঢুকিলেন দক্ষিণে ভবানী দত্ত গলির মধ্যে। খানিকটা অগ্রসর হইয়া হিমাংশু বলিলেন—এ-সাজ ঠিক হয়েছে, গুণময়।

গুণময় বলিল—পথে ভিখিরী সেজে থাকবো। দুজন জমাদার থাকবে বে-উর্দ্দী (অর্থাৎ সাদা-সিধা পোষাকে ; পুলিশের পোষাকে নয়) যেন ফিরিওলা। আপনি বাঁশী নিয়েছেন তো ? বাঁশী শুনলে আমরা যাবো। আমার কাছে রিভলভার আছে... টর্চ্চ আছে...জমাদারদের কাছেও অস্ত্রশস্ত্র আছে। আপনার হুকুম না পেলেও তাদের আমি ফিরিওলা সাজিয়ে সঙ্গে এনেছি। ঐ মোড়ে দেখবেন যদুনন্দন বিক্রী করছে টোয়ালে-গামছা...আর ওয়াহেব বিক্রী করছে ছড়ি-লাঠি।

হিমাংশু কি ভাবিলেন, ভাবিয়া বলিলেন—হুঁ...বেশ করেছো। তাহলে তোমরা আমার আগে চলে যাও। দর্জ্জীপাড়ায় মন্দির লেন। সেখানে নতুন বাড়ী হচ্ছে,... হুঁশিয়ার··কেউ না সন্দেহ করে।...

গুণময়কে বিদায় দিয়া হিমাংশু গিয়া ঢুকিলেন শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট দিয়া এম্ সি সরকারের বইয়ের দোকানে। এ-মাসের 'মৌচাক' বাহির হইয়াছে—প্যাকেট-বাঁধা বইয়ের রাশ... দুজন কিশোর গ্রাহক দোকানের মালিক সুধীর সরকারের সঙ্গে তর্ক জুড়িয়া দিয়াছে—আপনারা যদি ছেপে না বার করেন, তাহলে আমরা লেখক হবো কি করে ? সুধীরবাবু বলিতেছেন—হাতের লেখা কত মক্‌সো করে তবে সে-লেখা

মানুষের সমাজে দেখাবার যোগ্য হয়। আর তোমরা ভাবো, সদ্য পদ্য-গদ্য লিখতে শিখেই এমন লেখা লিখেছো যে তা কাগজে ছাপাবার যোগ্য হয়েছে।...

এই তর্কের মাঝখানে হিমাংশুর প্রবেশ।

সুধীরবাবু বলিলেন—আসুন হিমাংশুবাবু...বসুন। তারপর কি খপর ?

হিমাংশু বসিলেন, বলিলেন—খপর আর কি। সব খুব dull চলেছে। আপনারা এ্যাডভেঞ্চার আর থ্রিলারের যে-সব গল্প লেখেন, বাঙালী বদমায়েসদের অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি-কাহিনী... সেগুলো বন্ধ করে দিন মশায়। পড়ে হাসি পায়। এখানকার বদমায়েসদের ক্ষমতা বড় জোর ঐ সিঁধ কেটে ব্যাঙ্ক লুঠ, পোষ্ট-অফিস লুঠ, না হয় বড় লোকের বাড়ীর তেতলায় উঠে সিন্দুক থেকে গহনা সরানো, কিম্বা অন্ধকার পথে কাকেও একলা পেলে ছোরা দেখিয়ে তার সব কেড়ে নেওয়া, আর না হয় জুচ্চুরির ফাঁদ পাতা ..এই তো ?

সুধীরবাবু বলিলেন—ভালো কথা। আজকের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখছিলুম...ঐ নীল আলো...কি ব্যাপার, মশায় ? বলুন তো...সত্যি, ওরা কিছু করেছে ?

হিমাংশু বলিলেন—করেনি ? মানুষ গায়েব করেছে।

সুধীরবাবু শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন—সত্যি ?

—সত্যি। রিপোর্ট পেয়ে আমরা ঐ বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিয়েছি। দেখুন যদি গ্রেফ্‌তার করিয়ে দিতে পারেন, তাহলে রিওয়ার্ড পাবেন পাঁচশো টাকা।

সুধীরবাবু বলিলেন—বই বেচবো, না, আলো ধরবো ? আপনিও যেমন !

নীল আলো

ওদিকে পথে হঠাৎ লোকজনের ছুটাছুটি···হৈ-হৈ চীৎকার,—আলো···আলো···নীল আলো ··

এ-কথা কর্ণগোচর হইবামাত্র হিমাংশুবাবু ছুটিযা পথে আসিলেন···আসিয়া আকাশের দিকে চাহিলেন ··ঐ যে উত্তর-দিকের আকাশ নীলে নীল।

তিনি আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলেন না ··হ্যারিসন রোডে আসিযা সামনে চলন্ত খালি ট্যাক্সি থামাইযা সেই ট্যাক্সিতে চড়িয়া বসিলেন, বলিলেন···শ্যামবাজার চলো···

গাড়ী চলিল কর্ণওযালিশ ষ্ট্রীট ধরিযা। গাড়ীতে বসিযা হিমাংশু দেখিলেন ··ও আলো ··বোধ হয, টালার কাছে। টালায জলের ট্যাঙ্ক···তার একটু এদিকে।···

ট্যাক্সি হেতুযার মোড়ে আসিযাছে· ·আকাশের নীল আলো নিবিয়া গেল। হিমাংশুর মনে নিমেষের দ্বিধা···দর্জ্জীপাড়ার মন্দির লেনে যাইবেন? না, টালার কাছে ··যেখানে নীল আলোর সদ্য-বিকাশ?

ভাবিলেন, মন্দির লেনের দিকে গুণময গিযাছে···শ্রীশের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য সময নির্দ্দিষ্ট আছে। সে সমযের যদি একটু নড়চড় হয, কি ক্ষতি। ওদিকে টালায যদি কোনো সন্ধান মেলে···

শ্যামবাজারের মোড়ে লোকে লোকারণ্য। সন্ধান লইযা হিমাংশু গেলেন দেশবন্ধু পার্কের কাছে। সেইখানে একটা বাড়ীর ছাদে আতসবাজি···নীল আলোর তীব্র রশ্মি।

তিনি আসিলেন দেশবন্ধু-পার্কের সামনে। একটা খালি বাড়ী···সদ্য তৈয়ারী হইয়াছে। সামনে 'টু-লেট্' কাঠ মারা।

বাড়ীর চার্জ্জে এক দরোয়ান। লোকে তাকে প্রশ্ন-বাণে জর্জ্জরিত করিতেছে। হিমাংশু যে কথা শুনিলেন, সে শ্রী পুরানো কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ীর মালিক কি কাজ করেন? শুনিলেন, জমিদার।...হিমাংশুর মনে বিস্ময়...জুয়েলারির সঙ্গে সম্পর্ক নাই...তবু এ বাড়ীর ছাদে নীল আলো জ্বলিল কেন?

আরো দু' চারিটা প্রশ্নে জানিলেন, বাবুর কন্যার বিবাহ... খুব সমারোহের বিবাহ। বিবাহ হইবে হুগলির ওদিকে মস্ত ধনী গুরুপদ চাটুয্যে...তাঁর পুত্রের সহিত। বাড়ীর মালিকের নাম যতীশ গাঙ্গুলি...তিনি থাকেন রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে।

দরোয়ানকে লইয়া হিমাংশু তখনি ট্যাক্সিতে চড়িয়া রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে ছুটিলেন।

জমিদার যতীশ গাঙ্গুলির সঙ্গে দেখা হইল। তিনি খুব ব্যস্ত।

হিমাংশু বলিলেন—আমার কথা যদি না শোনেন, বিপদ হবে। আমি পুলিশ-অফিসার..লালবাজার থেকে আসছি। গোপনে আপনার সঙ্গে দু'চারটে কথা কইতে চাই...

যতীশ গাঙ্গুলি ভয়ে কাঁটা হইয়া বলিলেন—আসুন তাহলে আমার খাশ-কামরায়।

দোতলায় যতীশ গাঙ্গুলির খাশ-কামরা। সজ্জিত কামরা। কামরার ত্রিসামায় কেহ যেন না আসে। সকলকে নিষেধ করিলেন।

কামরায় বসিয়া যতীশ গাঙ্গুলি প্রশ্ন করিলেন—বলুন মশায়, কি বলবেন। ভয়ে আমার বুকের মধ্যে যা হচ্ছে...ওঃ।

হিমাংশু বলিলেন—আপনার মেয়ের বিয়ের জন্য আপনি নিশ্চয় বহুৎ জুয়েলারি কিনেছেন।

যতীশ গাঙ্গুলির বুকখানা ধড়াশ করিয়া উঠিল! চোরাই জুয়েলারি না কি? তিনি বলিলেন—কেন, বলুন তো?

হিমাংশু বলিলেন—আপনার ভয় নেই…আপনি নির্ভয়ে জবাব দিন। কিনেছেন তো?

—কিনেছি।

—কত টাকার এবং ক'টা জিনিষ?

যতীশ গাঙ্গুলি বলিলেন—কিনেছি একটা নেকলেশ; একটা ডায়মণ্ড-ক্রাউন; আর কতকগুলো চুণী, পান্না…তা দাম হবে শবশুদ্ধ প্রায় পনেরো হাজার টাকা।

হিমাংশু বলিলেন—কার কাছ থেকে কিনেছেন?

যতীশ গাঙ্গুলি বলিলেন—হীরাচাঁদ প্রেমচাঁদ বলে' একটা ফার্ম্ম আছে…সেই ফার্ম্ম থেকে এসেছিল তাদের ক্যালকাটার ম্যানেজার অমরচাঁদবাবু…তিনি দিয়ে গেছেন।

হিমাংশু বলিলেন—হুঁ…এ-ফার্ম্মের সঙ্গে আপনার কত কালের কারবার?

যতীশ গাঙ্গুলি বলিলেন—কোনোকালে জানাশোনা ছিল না। মেয়ের বিয়ে…আমার এক বন্ধু প্রমথবাবু…তাঁর বাড়ী ভবানীপুরে…তিনি বিদেশে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর বিশেষ জানা জুয়েলার আছে অমরচাঁদবাবু, জুয়েলারি নিয়ে তিনি আসবেন। জিনিষ খাঁটা এবং অমরচাঁদবাবু হলেন প্রমথবাবুর খুব বিশ্বাসী লোক।

হিমাংশুর মনের চাঞ্চল্য একটু ঘুচিল! তিনি বলিলেন—প্রমথবাবুর নাম বললেন…কোন্ প্রমথবাবু? প্রমথ চৌধুরী? ভবানীপুর কাঁশারিপাড়ায় বাড়ী? জমিদার?

যতীশ গাঙ্গুলি বলিলেন—হ্যাঁ…আপনি চেনেন তাঁকে?

—চিনি। প্রমথবাবু এখন কোথায়, জানেন ?

যতীশবাবু বলিলেন—কেন বলুন তো ? প্রমথবাবু বিদেশে আছেন। তবে তাঁর আসবার কথা আছে দু' চারদিনের মধ্যে।...আমি লিখেছিলুম, মেয়ের বিয়ে...তিনি না এলে আমি ভয়ানক রাগ করবো। তাতে লিখেছেন, নিশ্চয় আসবেন।...দাঁড়ান, আজ হলো শুক্রবার...ঠিক গেল-রোব্‌বারে আমি সে-চিঠি পেয়েছি।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া হিমাংশু বলিলেন—হুঁ...কিন্তু এখন বেশী কথা বলতে পারবো না। শুধু এইটুকু জেনে রাখুন, প্রমথবাবু নিরুদ্দেশ...আমরা তাঁর সন্ধান করছি। ভালো কথা, আপনারি ঐ নতুন বাড়া দেশবন্ধু পার্কের সামনে ?

—আজ্ঞে, হাঁ।

ও-বাড়ীতে নীল আলোর সঙ্কেত দেখেছেন ? খারাপ লক্ষণ !...আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে। একা থাকবেন না, কোথাও বেরুবেন না। দরোয়ানকে বলে দেবেন—কোনো অজানা লোককে যেন বাড়ী ঢুকতে না দেয়। তারপর শ্যামপুকুর থানায় আমি ফোন করে বলে দিচ্ছি...স্ট্রং পাহারার ব্যবস্থা করবে তারা।...আপনার মেয়েকেও খুব সাবধানে রাখবেন... বুঝলেন ?

যতীশ গাঙ্গুলির দু' চোখ যেন কপালে উঠল! তিনি বলিলেন—সামনের বুধবারে বিয়ে...সোমবার গায়ে হলুদ...

হিমাংশু বলিলেন—এর বেশী বলবার সময় এখন নেই। যা বললুম...যদি না শোনেন, বিপদের অন্ত থাকবে না।... আমায় এখনি যেতে হবে। যাবার আগে থানায় টেলিফোন্ করে দি।

নীল আলো

যতীশ গাঙ্গুলি হিমাংশুকে আনিলেন অফিস-কামরায়। সে-ঘর হইতে তিনি শ্যামপুকুর থানায় ফোন করিয়া দিলেন পাহারাদারীর ব্যবস্থা করিবার জন্য।

হিমাংশু আর বিলম্ব করিলেন না। পথে ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া-ছিল, সেই ট্যাক্সিতে বসিয়া ড্রাইভারকে বলিলেন—দর্জ্জীপাড়া ··

গাড়ী চলিল।

যতীশবাবুর চোখের সামনে আলো যেন নিবিয়া গেল। মনে হইল, তার জীবনে যেন পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়া গিয়াছে।

দশম পরিচ্ছেদ

বন্দী

দর্জ্জীপাড়ার পথে খানিকটা আসিয়া হিমাংশু ট্যাক্সি হইতে নামিলেন। নামিয়া পদব্রজে চলিলেন। গুলু ওস্তাগরের গলির মোড়ে একজন ভিখারী হাঁকিতেছে—একঠো পয়সা দে বাবা···ভুখা আছি···কুছ্ নেহি খায়া, বাবা···

হিমাংশু চিনিলেন, গুণময়। চারিদিকে চাহিয়া কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—খপর কি ?

গুণময় কহিল—একটা লোক মন্দির লেনের কাছে পায়চারি করছে, স্তর।

—বেশ···তোমরা হুঁশিয়ার থেকো। ওয়াহেদরা ঠিক আছে ?

—হ্যাঁ···

—মন্দির লেন কোন্ দিকে ?

গুণময় পথের নির্দ্দেশ দিল। হিমাংশু মন্দির লেনের সামনে আসিলেন। আশে-পাশে বস্তী। একটু দূরে একটা ছাপাখানা···এখন বন্ধ আছে। বস্তী হইতে চ্যা-ভ্যাঁ শব্দ উঠিতেছে···দূরে দুজন লোক ভীষণ ঝগড়া করিতেছে।

মন্দির লেন খুব সরু গলি। এককালে বোধ হয় ড্রেন ছিল···এখন ইঁট-বাঁধানো দেহে মন্দির লেন নাম লইয়াছে।

নীল আলো

গলির মুখে একটা গ্যাস্‌পোস্ট······মিট্‌মিট্‌ করিয়া আলো জ্বলিতেছে।

গলির মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখেন, সরু হইলেও গলিটি সিধা নয়—আঁকিয়া-বাঁকিয়া গিয়াছে···কোথায়, কে জানে।

কিন্তু শ্রীশ চক্রবর্ত্তী? সে? কোথায়?

ওদিকে ফিরিওয়ালার কণ্ঠ শুনা গেল—লাঠি চাই—ভালো ছড়ি···

হিমাংশু চিনিলেন, ওয়াহেব।

হিমাংশু গলির মধ্যে ঢুকিলেন···

দু'পা অগ্রসর হইয়াছেন, শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা। শ্রীশ বলিল—এই যে মশায়···আঃ!

হিমাংশু বলিলেন—কি খবর?

শ্রীশ বলিল—এখনো তারা আসেনি···তবে সরঞ্জাম এসেছে···মস্ত একটা লোহার চোং···তার গায়ে কাঁচ আঁটা। নীল কাঁচ। ···কিন্তু সন্দেহ করবে না কি? সেটা রেখেছে একটু-আগে দত্তদের একটা পুরোনো বাড়ী আছে—খালি বাড়ী—সেই বাড়ীর উঠোনে!

হিমাংশু ভাবিলেন, যন্ত্র যদি আসিয়া থাকে, তাহা হইলে যন্ত্রীর দলও আসিবে! কিন্তু উহারা যদি এখানে আসিল, তাহা হইলে যতীশবাবুর বাড়ীতে সঙ্কেত দিবার অর্থ কি?

শ্রীশ বলিল—আসবেন?

—হ্যাঁ।

শ্রীশের সঙ্গে হিমাংশু আসিয়া ঢুকিলেন জীর্ণ পরিত্যক্ত এক মস্ত বাড়ীর মধ্যে। সামনে উঠান। অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া আছে। বাড়ীখানা হাঁ করিয়া যেন সব-কিছু গিলিতে চায়!

শ্রীশ বলিল—এই সে যন্তর ! বলিয়া টর্চ্চের আলো ফেলিল। সে-আলোয় হিমাংশু দেখিলেন, কোণে করবীর ঝাড়······ ডাল-পালা মেলিয়া অন্ধকারকে আরো নিবিড় করিয়াছে। সেই ঝোপ-ঝাড়ের কাছে মস্ত একটা টিনের ল্যাম্প। একদিকে ঘেরা···দেখিতে অনেকটা সিনেমা-ল্যাম্পের মতো। কিন্তু বিস্ময় বোধ করিলেন···শ্রীশ খুব ওস্তাদ লোক তো! টর্চ্চ-ল্যাম্পও সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে।

হিমাংশু বলিলেন—এ জিনিষ কে আনলে, কখন আনলে, দেখেছো?

শ্রীশ বলিল—পনেরো-কুড়ি মিনিট আগে, স্যর। আপনি আমাকে টাইম দিয়েছিলেন, আমি এসে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি ঐ গুলু ওস্তাগরের লেনে···দেখি একটা লোক···তার মাথায় এই লণ্ঠন···লোকটা গলির মধ্যে ঢুকছে। দেখে আমি তার পিছনে-পিছনে গলিতে এনুম। এসে দেখি, এই ব্যাপার।

—লোকটা কি জাত?

—খোট্টা।

—তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলে?

—না স্যর···যদি সন্দেহ করে?

—সে-লোকটা সটান এ-বাড়ীর মধ্যে এলো? কাকেও কোনো কথা না বলে?

—হ্যাঁ, স্যর।

—সে চলে গেল কখন?

—যায়নি স্যর।

হিমাংশুর বিস্ময়ের সীমা নাই! কুলি···মোট নামাইয়া এইখানেই রহিয়া গেছে!

শ্রীশ বলিল—হয়তো বলে দেছে, সেখানে অপেক্ষা করবে... যতক্ষণ না আমরা যাই।

হিমাংশুর মনে চকিত-সংশয়। তিনি বলিলেন—কিন্তু সে গেল কি না গেল, তুমি কি করে জানলে?

শ্রীশ বলিল—আমি এ-বাড়ীর দোরে হত্যা দিয়ে পড়ে আছি স্যর, আর আমি জানবো না?

হিমাংশু বলিলেন—বাড়ীতে কে আছে?

শ্রীশ বলিল—কেউ না, স্যর। পাড়ার দু-চারজনকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি। সকলে বলে, পোড়ো বাড়ী...ভূত আছে, কেউ এদিকে ঘেঁষে না।

—হুঁ।

হিমাংশু বলিলেন—এক কাজ করো...তুমি নীচে থাকো। যদি কলিকে ছাখো, তাকে ধরবে। আমি একবার উপর-তলাটা ঘুরে আসি।

শ্রীশ বলিল—অন্ধকারে যাবেন না স্যর। আমার টর্চটা নিয়ে যান।

হিমাংশু বলিলেন—তুমি অন্ধকারে থাকবে?

শ্রীশ বলিল—অন্ধকার কিসের! আমি ঐ মোড়ে পানের দোকান থেকে বাতি কিনে আনছি......পকেটে দেশলাই আছে।

শ্রীশ চক্রবর্ত্তীর প্রচণ্ড উৎসাহ। হিমাংশু বলিলেন—তোমার যে দারুণ উৎসাহ দেখছি!

শ্রীশ বলিল—বলেন কি স্যর, পয়সার যে-কষ্ট চলেছে... বিজ্ঞাপন দেখে মনে হচ্ছে, ভগবানের ইঙ্গিত! বরাতে যদি লেগে যায় ঐ পাঁচশো টাকা রিওয়ার্ড!

হিমাংশু বলিলেন—টর্চ্চ রাখো শ্রীশবাবু। আমার পকেটে দেশলাই আছে, বাতি আছে। সিঁড়ি?

শ্রীশ বলিল—এই যে স্যর, এই দিকে।

শ্রীশ তাহা হইলে সব দেখিয়া-শুনিয়া রাখিয়াছে…হুঁ।

হিমাংশু সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিলেন। পাশাপাশি অসংখ্য ঘর। সব খালি। সদর-মহলের বারান্দা পার হইয়া ভিতর-মহলে ঢুকিলেন…যেমন ঢোকা, মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর—এত সহজে ফাঁদে পা দেবে, তা ভাবিনি, হিমাংশুবাবু।

আচমকা ঘা খাইয়া হিমাংশু পড়িয়া গেলেন। কিন্তু তখনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চকিতে পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া ফায়ার করিলেন। আওয়াজ হইল, দুম্। একটা চীৎকার। কার গায়ে লাগিল, ফিরিয়া দেখিবেন কি, দেখার আগেই মুখে পড়িল টর্চ্চের আলো…এবং পিছন হইতে পিছমোড়া করিয়া সজোরে কে তাকে ধরিয়া ফেলিল। সেই সঙ্গে পায়ে লাঠি…হিমাংশু পড়িয়া গেলেন। হাত হইতে রিভলভার ছিট্‌কাইয়া গেল।

তারপর কণ্ঠ—পাঁচশো টাকা প্রাইজ…কি বলেন হিমাংশু-বাবু?

এ স্বর তিনি চিনিলেন। শ্রীশের কণ্ঠ। মনে এ-সন্দেহ জাগিয়াছিল। তবু সাহস করিয়া আসিয়াছিলেন, শ্রীশ তো হাতের নাগালে…যদি তার সঙ্গে বাকীগুলোকে পান্।

শ্রীশ আসিয়া বলিল—আমাদের আজকের কাজ এখানে নয়, তবে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে খপরটা জাহির করেছেন, তাই

আপনাকে শায়েস্তা করা দরকার ছিল। এতদিন পুলিশে চাকরি করছেন···বিজ্ঞাপনে নিজের নামটুকু না দিলেই পারতেন! দলশুদ্ধ সকলে জেনে ফেললে, আপনি পিছু নিয়েছেন।

হিমাংশু কোন কথা বলিলেন না। এ ভুলখানি বেকুবির! ভালো করেন নাই।

শ্রীশ ডাকিল—তারিণী···

উত্তর হইল—যা।

শ্রীশ বলিল—হাত-পা বেঁধে আপাততঃ ভিতরের ঐ ছোট কামরায় ফেলে রাখো। তারপর সেই ওষুধ··অজ্ঞান হয়ে যাবে, তখন মুর্দ্দা চালান।

হিমাংশুর হাতে-পায়ে দড়ির বাঁধন। ছোট একটা কুঠরীর মধ্যে তাকে ঠেলিয়া বাহির হইতে সকলে কুঠরীর দ্বার বন্ধ করিল।

বাহিরে পায়ের শব্দ ও শ্রীশের কণ্ঠ—আমাদের সঙ্গে ওস্তাদি! সাত্যাক্রর খোঁজ করুন এখন।

আর একজন বলিল—সিক্রেট পুলিশ।

হিমাংশু শুনিলেন—কণ্ঠ ক্রমে ওদিকে মিলাইয়া গেল।

চারিদিকে জমাট স্তব্ধতা···সে স্তব্ধতার বুকে হিমাংশু বসিয়া আছেন···জীব-জগতের সঙ্গে যেন তার সব সম্পর্ক মুছিয়া গিয়াছে।···

বস্তীর বুক হইতে মাঝে-মাঝে দু-একটা কথা ভাসিয়া আসে। ঐ যদুনন্দন হাঁকিতেছে, তোয়ালে-গামছা···হিমাংশু ভাবিলেন, বাঁশী কাছে আছে···বাজাইবেন না কি? কিন্তু বন্ধ ঘর হইতে বাঁশীর শব্দ বাহিরে যাইবে কি?

হিমাংশু নিঃশব্দে পড়িয়া রহিলেন অনেকক্ষণ। তারপর শানের মেঝেয় সজোরে বাঁধনের দড়ি ঘষিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অবশেষে

হাতের দড়ি কাটিয়া গেল। তখন পায়ের বাঁধন খুলিতে বিলম্ব হইল না। হিমাংশু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। টর্চ্চের আলো ফেলিয়া দেখেন, ঘরে একটিমাত্র দ্বার। জানলা বা ঘুলঘুলির নাম-গন্ধ নাই!

প্রহরের পর প্রহর চলিয়াছে। বাহিরের কোলাহল স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। হিমাংশুর মনে হইল, তারা বোধ হয় এখানে নাই। শ্রীশ ঐ যে বলিল, আজিকার কাজ এখানে নয়, অন্যত্র ...তবে কি যতীশ গাঙ্গুলির গৃহে?

তা যদি হয়, তত ভয় নাই। ও-বাড়ীতে গিয়া যতীশ গাঙ্গুলিকে সতর্ক করিয়া আসিয়াছেন। সেখানে পুলিশ-পাহারার বন্দোবস্ত আছে।

দূরে কোথায় ঘড়ি বাজিল, দুটো। ভাবিলেন, গুণময়? যদুনন্দন? ওয়াহেব? তারা কি করিতেছে? হিমাংশু এ-পথে আসিয়াছেন...এখনো ফিরিতেছেন না, তবু তারা চুপ...

শ্রীশ বলিল, ওষুধ দিয়া অজ্ঞান-অচেতন......তার মানে, ক্লোরোফর্ম্ম। বেশ, আসুক একবার...প্রাণপণে যুঝিবেন! মরণ-বাঁচন সংগ্রাম!

দেওয়ালে ঠেশ দিয়া হিমাংশু চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

নীল আলো

ভাবিলেন, ভোর হইতে কতক্ষণ···দিনের বেলায় সহরের বুকে তারা কি করিতে পারে ?

তারপর বহু ক্ষণ কাটিয়া গেল···

বাহিরে পায়ের শব্দ। হিমাংশু উৎকর্ণ। কারা আসিতেছে না ?

দ্বারের বাহিরে কণ্ঠ—হিমাংশুবাবু···

তিনি সাড়া দিলেন না। আবার কণ্ঠ—ঘুমোলেন না কি ?

আর-এক কণ্ঠের স্বর ফুটিল—ঘুমিয়েছে। মানুষ তো! পুলিশ বলে ঘুমকেও জয় করবে ?

চাবি খোলার শব্দে হিমাংশু উঠিয়া দ্বারের পাশে হুঁশিয়ার হইয়া দাঁড়াইলেন···বাঁধনের সেই দড়িতে ফাঁশ লাগাইয়া আক্রমণের জন্য সমুদ্যত।

দ্বার খুলিবামাত্র ঘরের মধ্যে আলোর রশ্মি···সঙ্গে সঙ্গে একজন ঘরে প্রবেশ করিল। অমনি সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ে দড়ির ফাঁশ লাগাইয়া হিমাংশু দিলেন টান। লোকটা ধুপ করিয়া পড়িয়া গেল। বাহির হইতে সঙ্গী বলিল,—পড়ে গেলি ?

এ-লোকটা বলিল—হুঁশিয়ার!

হিমাংশু চুপ করিয়া রহিলেন না। দ্বার ঠেলিয়া লাফ দিয়া বাহিরে আসিলেন। আর-একগাছা দড়ি ছিল হাতে। তাগ করিয়া সে-দড়ি ছুড়িয়া ফাঁশ টানিলেন। এ-লোকটার গায়ে দড়ির বাঁধন পড়িল। লোকটা ছিল নিশ্চিন্ত। এমন অতর্কিত আক্রমণ···সে পড়িয়া গেল। হিমাংশু তখন আরও জোরে ফাঁশ টানিলেন। লোকটা আর নড়িতে পারে না। বন্দী!

হিমাংশু লাফ দিয়া বাহিরে আসিয়া ঘরের দ্বার সবলে

ভেজাইয়া দিলেন···কড়ায় ছিল তালা-চাবি। তালা বন্ধ করিয়া নিজের পকেটে চাবি রাখিলেন। ও লোকটা বন্দী। হিমাংশু এখন তার সঙ্গীর দিকে মনো'নিবেশ করিলেন। পায়ের দড়ি টানিয়া তার হাত দুখানা বাঁধিয়া ফেলিলেন···তারপর বাঁশীতে দিলেন ফুঁ।

গুণময় ছিল বাহিরে বাড়ীর কাছে।···বাঁশী বাজিবার পরে গুণময়ের কণ্ঠ শুনিলেন—কোন্ দিকে স্যর?

—এইখানে···

গুণময় আসিল···সঙ্গে যদুনন্দন এবং ওয়াহেব।

হিমাংশু বলিলেন—একজন এখানে···আর একজন ঐ ঘরে তালা-বন্দী।

লোকটাকে যদুনন্দন গুঁতা দিল, বলিল—ওঠ্! নবাব··· শুয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছেন।

ওয়াহেব তার পিঠে সবেগে লাথি মারিল···লোকটা কোঁক্ করিয়া উঠিল।

হিমাংশু বলিলেন—ভিতরের লোকটাকে কায়দা করতে হবে। আমার রিভলভারটা ঘরে আছে···হয়তো হাতে নিয়েছে···সাবধান!

যে-লোকটা বাহিরে ছিল, তাকে সার্চ করা হইল।···তার কাছে রিভলভার নাই···ও ঘরে তার সঙ্গীর কাছে যদি থাকে?

গুণময় বলিল—আমার কাছে রিভলভার আছে। আমি ওকে দেখছি, স্যর···

হিমাংশু বলিলেন—তোমার রিভলভার আমায় দাও···তুমি থাকো আমার পিছনে! দরজা খুলে সরে দাঁড়াবো···তারপর ফায়ার···

তাই হইল—দ্বার খুলিবামাত্র ভিতর হইতে সে-লোক গুলি ছুঁড়িল। হিমাংশু এবং গুণময় সরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন—গুলি লাগিল না।

ওয়াহেব বলিল—আমি যাবো ঘরে…

বলিয়া সবলে দ্বার ঠেলিয়া লাফাইয়া ঘরের মধ্যে পড়িল। …তারপর ভিতরে প্রচণ্ড ধ্বস্তাধ্বস্তি।

লোকটা গ্রেফ্‌তার হইল। হিমাংশু চিনিলেন…সেই শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী…

হিমাংশু বলিলেন—পাঁচশো টাকা না নিয়ে ছাড়লেন না, শ্রীশবাবু!

বড়তলা থানায় আসামীদের চালান দিয়া হিমাংশু ছুটিলেন যতীশ গাঙ্গুলীর গৃহে। সেখানে বেশ কলরব।

রাত্রি দশটার সময় একজন ভদ্রলোককে এ-বাড়ীর সামনে পায়চারি করিতে দেখিয়া শ্যামপুকুর থানার অফিসার সমর মিত্র তাকে চ্যালেঞ্জ করেন। লোকটা আমতা-আমতা করিয়া গা-ঢাকা দিবার প্রয়াস পাইতেছিল, সমর মিত্র তখনি তাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া থানায় লইয়া গিয়াছেন। এ-বাড়ীর সামনে সারা রাত্রি পাহারা চলিতেছে…

ভিতরে গিয়া হিমাংশু সন্ধান লইলেন। যতীশ গাঙ্গুলি জাগিয়া ছিলেন, বলিলেন, ব্যাপার কি হিমাংশুবাবু?

হিমাংশু বলিলেন—ঘুমোন নি বুঝি?

যতীশ গাঙ্গুলি বলিলেন—না। যে ভয় দেখিয়েছেন মশায়, এতে কখনো ঘুম হয়!

হিমাংশু হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন—নাচে পাহারা

আছে···স্বচ্ছন্দে ঘুমোন। কাল এসে মজার গল্প বলবো, শুনবেন'খন।

এ বাড়ী হইতে হিমাংশু আসিলেন শ্যামপুকুর থানায়। সমর মিত্র বসিয়া ডায়েরি লিখিতেছিলেন। তাঁর কাছে শুনিলেন, এ-লোকটার কাছে পাওয়া গিয়াছে কতকগুলা চিঠিপত্র ··আর একটা কাগজের কৌটায় কতকগুলা চুণী-পান্না···

হিমাংশু খুশী হইলেন। বলিলেন—তবু ভালো! এখন বাকী সাত্যকী আর প্রমথবাবুর উদ্ধার। দেখি সমর, কি চিঠি-পত্র পাওয়া গেছে।

সমর মিত্র কহিল—লাল রঙের কখানা শ্লিপ ··তাতে T অক্ষর লেখা···আর হিজিবিজি।

হিমাংশু বলিলেন—ঐ তো আলো···নীল আলো!

নীল আলো! সমর মিত্র বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিল হিমাংশুর পানে।

হিমাংশু বলিলেন—কাগজ আনো সমর। তারপর আরব্য উপন্যাসের গল্প বলবো, শুনো।

কাগজপত্র হইতে দু-তিনটি ঠিকানা পাওয়া গেল—কলিকাতার ঠিকানা।

১। ৩৭ নম্বর কমল মজুমদার ষ্ট্রীট
২। ১২ নম্বর পীটার্স্ লেন
৩। ১১২ নম্বর রাজা সুখেন্দুনারায়ণ ষ্ট্রীট

তিন ঠিকানায় সন্ধান মিলিল। ১২ নম্বর পীটার্স্ লেনে একরাশ্ কাবলীর বাস···সে-বাড়ীতে সাত্যকিকে পাওয়া গেল।

নীল আলো

১১২ নম্বরের বাড়ীতে পাওয়া গেল প্রমথ চৌধুরীকে। ৩৭ নম্বরে মিলিল অমরচাঁদ শেঠকে।

তারপর জানা গেল, সাত্যকি যখন হাওড়া ষ্টেশনে.... একজন লোক আসিয়া বলে, একটা কথা আছে, শুনুন....হিমাংশু তখন দোতলায় গিয়াছেন। সাত্যকি ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চাহিল। অমনি একটা ভিড়...সে-ভিড়ের মধ্য হইতে তীব্র একটা গন্ধ সাত্যকির নাকে আসিয়া লাগিল। মাথা ঘুরিয়া গেল ...তারপর যখন চোখ চাহিল, দেখে, বন্ধ ট্যাক্সির মধ্যে...ট্যাক্সি চলিয়াছে নক্ষত্রের বেগে। ইহার বেশী সে আর কিছু জানে না।

প্রমথ চৌধুরী বলিলেন—বিছানায় শুইয়াছিলেন। জাগিয়া দেখেন, এ বাড়ীতে। মনে হইয়াছিল, কি যেন স্বপ্ন দেখিতে-ছিলেন। যেন একটা তীব্র গন্ধ...সে-গন্ধে নিশ্বাস বন্ধ হইবার জো। তারপর এই গৃহ...

অমরচাঁদ বলিলেন—তিনি থাকেন বেলিয়াঘাটায়। দশ বছর যাবৎ চৌধুরীবাবুর সঙ্গে তার কারবার। যতীশবাবুকে জুয়েলারি দিয়াছিলেন।...তারপর রাতে যখন বাড়ী ফিরিতে-ছিলেন রিক্‌শ চড়িয়া...গাড়ীর চাকা খুলিয়া গেল। গাড়ী গেল পড়িয়া, সঙ্গে সঙ্গে তিনিও...তারপর চার-পাঁচজন লোক আসিয়া তাকে ধরিয়া ট্যাক্সিতে তুলিল। বলিল— তার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে...হুঁশিয়ার। গাড়ীতে তীব্র গন্ধ... তারপর আর কিছু জানেন না। জ্ঞান হইলে দেখেন, এ-বাড়ীতে তিনি বন্দী।

আসামীদের আঙুলের ছাপ লওয়া হইল। কাশীনাথ ধরা পড়িয়াছে! এবারে সে নাম লইয়াছে মধুসূদন। ঝুলো-গোঁফ

নীল আলো

তান্তিয়া ধরা পড়িয়াছে। সেই সঙ্গে ধরা পড়িয়াছে আর-একজন বাঙালী। তার নাম মতি ওরফে শ্রীশ চক্রবর্ত্তী! নাগপুরে সে কোন্ ব্যাঙ্কে কাজ করিত···ব্যাঙ্কের টাকা ভাঙ্গিয়া একবার জেলে গিয়াছিল···জেল হইতে বাহির হইয়া ইহাদের দলে ঢুকিয়াছে।

নীল আলোর অর্থ শুনিলেন সাত্যকির কাছে। রামটেকের সেই পাহাড়ের উপর আসামীদের নজর আছে' উহাদের দলের লোক সাজিয়া সাত্যকি যে-মণি-রত্ন লইয়াছিল ···তারপর সে সরিয়া পড়িলে কাশীনাথ আর তান্তিয়া পিছনে লাগে কেউটের মতো! এখনো প্রাণে না মারিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, তার কারণ, তান্তিয়া বলিয়াছিল, মণি-রত্ন আদায় করিয়া সেই রামটেকের পাহাড়ে লইয়া গিযা পাথরে ছেঁচিয়া মারিবে!···এমন ভাবে কত লোককে মারিয়াছে' তাই সাত্যকির অত ভয়।

বিচারে আ .মীদের জেল হইয়া গিয়াছে।

শেষ